পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

সূচীপত্র

———

শ্রীগৌতম বসু

কল্যাণীয়েষু

গৌতম,

এই বয়সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বে এবং তার অনুশীলনে তোমার যে নিষ্ঠা দেখেছি, তাতে শুধু খুশী নয়—আমি মুগ্ধ হয়েছি। সেজন্য এই বইখানি তোমাকে দিলুম।

শুভার্থী

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা

পৌষ, ১৩৪৯

আমরা চোখে দেখতে পাই না—যারা ক্লেয়ারভয়ান্ট, তারা দেখেন এই
এবং কখন কখন ক্যামেরাতেও পরীদের ফটো ওঠে। পৃষ্ঠা ১৫৩....

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

——:০: * :০:——

এক

গোড়ার কথা

টেব্‌ল্‌-টার্ণিংয়ের কথা বলছি। এর ইতিহাস জানা দরকার। প্রায় একশো বছর আগে···১৮৪৮ সালের মার্চ মাসের কথা।

আমেরিকার নিউ ইয়র্কে ছোট একটি সহর···সহরের নাম হাইড্‌স্‌ভিলা···এখানে এক ভাড়াটে বাড়ীতে ডেভিড ফক্স বলে এক ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করতেন। ফক্সের দুই কন্যা···তাঁরা হঠাৎ বাড়ীর নানা জায়গায় নানা রকম শব্দ শুনতে লাগলেন। কোথায় শব্দ হচ্ছে···কে শব্দ করছে···বহু চেষ্টাতেও সন্ধান মিললো না। এমন শব্দ প্রত্যহ হতে লাগলো এবং কন্যা দুটি শব্দের সন্ধান করেন···কিন্তু কোনো-দিনই শব্দের কোনো হদিশ পান না! মেয়েরা মাকে বললেন শব্দের কথা। মা বললেন, তিনিও শোনেন শব্দ···কিন্তু এ-সম্বন্ধে তিনি মাথা ঘামান না। কর্ত্তা ফক্সও শব্দ শোনেন··· তিনিও মাথা ঘামান না।

কিন্তু সত্যই তো, নিত্যদিন এমন শব্দ হয়···কে এ-শব্দ করে, কেন করে? তখন সকলে চঞ্চল হলেন। সকলে

ভাবলেন, এ শব্দ কে করে···কেন করে···জানতে হবে। সকলেই হুঁশিয়ার রইলেন।

তার পর একদিন যেমন শব্দ হওয়া···বাড়ীর গৃহিণীর কি মনে হলো, তিনি অন্তরীক্ষে প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন—কে শব্দ করছো? শব্দ যদি করতে চাও···বেশ···পর-পর ঐ এক জায়গায় দশবার শব্দ করো···শুনি!

এ প্রশ্ন-নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পর-পর দশবার সেই এক জায়গায় হলো একই রকম শব্দ!

সকলের শরীরে রোমাঞ্চ! গৃহিণী আবার বললেন—আচ্ছা, আমার কটি ছেলেমেয়ে···শব্দ করে নম্বর বলো তো?

সঙ্গে সঙ্গে দুবার শব্দ হলো। বাড়ীতে তাঁদের দুটি কন্যা···শব্দ হলো দুবার। তখন এমনি আরো কটি প্রশ্ন নিক্ষেপ করা হলো এবং শব্দের সংখ্যায় সে-সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর মিললো।

এমনিভাবে অলক্ষ্য শব্দের সঙ্গে চললো ফক্স-পরিবারের নানা কথার আদানপ্রদান। এবং শব্দের এই আদানপ্রদান থেকে প্রশ্নে এবং শব্দের সংখ্যায় সে-সব প্রশ্নের জবাবে একটি কাহিনী প্রকাশ পেলো। সে-কাহিনী—ঐ বাড়ীতেই এক ভদ্রলোক বাস করতেন···তাঁর নাম ছিল বেল···সেই বেলকে খুন করে একদল দুর্বৃত্ত বাড়ীর একটা ঘরের মেঝের নীচে তাঁর দেহ পুঁতে রেখেছে···বেলের আত্মা এ-বাড়ী ত্যাগ করে যেতে পারে না···তার আত্মা বাড়ীর লোকদের জানান দিতে চায়, সে আছে এ-বাড়ীতে।

এ-কাহিনী পাড়ায় প্রচারিত হলো এবং বাড়ীর নির্দিষ্ট ঘরের মেঝে খোঁড়া হলো; মেঝের নীচে থেকে বেরুলো

মানুষের কঙ্কাল···এ-কঙ্কালকে যথারীতি গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছিল।

এ-ঘটনার পর কজন চিন্তাশীল সুধীর মনে জাগলো কৌতূহল। তাঁরা তখন পরলোকগত আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপন করা যায় কি না, এ-তত্ত্ব-সন্ধানে উদ্যোগী হলেন।

এই উদ্যোগের ফল পাওয়া যায় শব্দের সাহায্যে পরলোকগত আত্মার সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদানে। ঘরে শব্দ করানো নয়···বহু গবেষণাদির পর টেবিল নিয়ে চক্রবৈঠক গঠনের ব্যবস্থা হয়। আমেরিকার কটি বৈঠকের সংবাদ য়ুরোপে প্রচারিত হয়; তখন য়ুরোপেও টেবিল-বৈঠকের ব্যবস্থা চললো। এঁদের অনুশীলনে একটা বিষয়ে সকলে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। সে-সিদ্ধান্ত:

কজন আত্মীয়-বন্ধু মিলেমিশে এক-মন হয়ে নিষ্ঠাভরে যদি সকলের জানাশোনা পরলোকগত কোনো ব্যক্তিকে আহ্বান করেন···তাহলে টেবিলে তাঁর আত্মার বা স্পিরিটের আবির্ভাব ঘটে। পরে···টেবিল থেকে চক্রে যাঁরা বসেন, তাঁদের কারো উপর স্পিরিটের ভর হয়। যাঁর উপর স্পিরিটের ভর হয়···তিনি মিডিয়াম। মিডিয়ামের উপর স্পিরিটের ভর হলে মিডিয়ামের নিজের সত্তা থাকে না···তিনি কেমন মূর্চ্ছাতুরের মতো থাকেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে স্পিরিট কথা কইতে থাকেন। যতক্ষণ মিডিয়ামের উপর স্পিরিটের ভর থাকে, ততক্ষণ মিডিয়ামের মন, মস্তিষ্ক প্রভৃতি তাঁর আয়ত্তে থাকে না—স্পিরিটের অধিকারে মিডিয়াম ততক্ষণ অভিভূত থাকেন।

চক্র বসানোর বিধি আছে। টেবিল-টার্ণিং বা মিডিয়াম

…দুটি চক্রেই যাঁরা বসবেন…তাঁদের সংখ্যা তিন থেকে সাতজন হবে—সাতজনের বেশী লোক চক্রে বসবেন না। এবং যাঁরা বসবেন, তাঁরা একমনে একই মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ বা ধ্যান করবেন…মনে তখন আর কোনো বা কারো চিন্তা থাকবে না। একাগ্র মন যেমন প্রয়োজন… তেমনি প্রয়োজন ধৈর্য্যের! বসবামাত্র ফল পাবেন, এমন না হতেও পারে। প্রথম দিনে ফল না পান, দ্বিতীয় দিনে… তৃতীয় দিনে নিশ্চয় ফল পাবেন।

টেবিলে বা মিডিয়ামে স্পিরিটের আবির্ভাব হবামাত্র চক্রে যাঁরা বসবেন…তাঁরা তা বুঝতে পারবেন। প্রশ্ন করবেন—আপনি এসেছেন কি? যদি এসে থাকেন টেবিলের অমুক দিককার পায়া তুলে একবার শব্দ করুন। কিম্বা চক্রে উপবিষ্ট কাকেও দেখবেন, মূর্চ্ছাতুরের মতো হয়েছেন। তাঁকে তখন প্রশ্ন করলেই স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাঁর মুখে পাবেন স্পিরিটের সাড়া। কখনো অধীর হবেন না।

নিয়মমতো বৈঠকের ব্যবস্থা করলে দেখবেন, বিলম্ব করতে হবে না…বসার সঙ্গে সঙ্গে স্পিরিটের আবির্ভাব হবে।

বৈঠক সম্বন্ধে মিসেস আনি বেসান্ত বলে গিয়েছেন— Be neat and clean and pure in mind. অর্থাৎ দেহে-মনে তখন পরিশুদ্ধ থাকতে হবে। পূজার্চ্চনার সময় যে-মন নিয়ে আমরা পূজায় বসি…তেমনি মন নিয়ে চক্রে বসতে হবে।

চক্রে বসবার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন—মনের একাগ্রতা বা ধ্যান।

টেবিলের পায়ায় শব্দ···মিডিয়ামের মুখে বাক্যযোজনার দ্বারা স্পিরিটের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা যেমন চলে··· তেমনি আবার মি'ডিয়ামের হাতের কলমে-পেন্সিলে লিখনের সাহায্যেও স্পিরিটের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলে। সে লিখনকে বলে—auto writing. এই auto writing সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে, তা আর বলবার নয়। আমাদের দেশেও কয়েকটি সাইকিক সমিতি বহু তত্ত্ব লাভ করেছেন।

এখন আর একটি প্রশ্ন ওঠে—যদু মধু হারু···সকলেই কি চক্রবৈঠকে বসে স্পিরিটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনা করতে পারেন? না, এর জন্য বিশেষ শিক্ষাদির প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যাঁরা বহু গবেষণাদি করেছেন, সেই সব সাইকিকতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন—এর জন্য বিশেষ শিক্ষা বা শক্তি-সাধনার প্রয়োজন নেই। আমাদের সকলের মনেই এ-শক্তি আছে। এ-শক্তি সুপ্ত থাকে···সাধনায় এ-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা চাই। সাধনায় বা চেষ্টায় এ-শক্তি অনায়াসে আয়ত্ত হবে। এ সম্বন্ধে কাথরিন বেটস্ বলেছেন—It is not impossible but it does call for more perseverence and concentration of purpose than most of us are willing to give or perhaps think ourselves capable of giving—কোনো স্পিরিটকে আনা অসম্ভব নয়···তবে তার জন্য চাই একাগ্রতা এবং ধৈর্য্য।

এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের একজন বিশেষজ্ঞের কথা প্রণিধানযোগ্য—মিডিয়াম-সাহায্যে স্পিরিটের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তিনি নিত্য-নিয়মিত বসতেন। তিনি

বলেন—বিয়োগবেদনাতুর কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে আমি কি করিব? উত্তরে তাঁহাকে বলিব, বেশী নহে, প্রতিদিন দশ মিনিটকাল আপনার সেই হারানো ধনটির চিন্তায় ডুবিয়া থাকুন—মনে রাখিবেন, বলিতেছি না যে চিন্তা করুন···বলিতেছি, চিন্তায় ডুবিয়া থাকুন। মন যখন আপনার অশান্ত নাই···দেহ যখন সুস্থ আছে···তখন নির্জনে দশ মিনিটকাল তাহার চিন্তায় নিজেকে ডুবাইয়া দিন। যতক্ষণ তাহাকে ভাবিবেন, ততক্ষণ যেন ভগবানের চিন্তাও না মনে আসে। মনে করিবেন, সে আছে আপনার পার্শ্বেই···দূরে নয়। লেখক বলেছেন—সে এত নিকটে আছে ইহাই জানিয়া তাহাকে তাহার প্রিয় নামটি ধরিয়া ধীরে ধীরে ডাকিবেন এবং বলিবেন, ওগো তুমি এসে···তুমি সাড়া দাও···আমার এই টেবিলটি দোলাইয়া উহার পায়াটি তুলিয়া আমাকে আগমন-বার্ত্তা জানাও।

এখানে একটি কথা বলি—টেব্‌ল্‌-টার্ণিং-এ দুজন তিনজন বসবার নিয়ম থাকলেও আমি একা বসে দেখেছি, একাগ্র মন নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে মৃত ব্যক্তিকে ডাকলে টেবিলে স্পিরিটের সাড়া মেলে···বহুবার আমি এমন সাড়া পেয়েছি। সব সময়ে চক্র গড়বার প্রয়োজন নেই···মিডিয়ামেরও প্রয়োজন হবে না!

টেবিল হেলানো বা টেবিল তোলার সম্বন্ধে বহু লোকের মনে সংশয় আছে যে, যাঁরা টেবিলে বসেন··· তাঁদের মধ্যে কেউ এ-কাজ করেন! এ-সংশয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—স্পিরিট নিজের হাতের চাপ দিয়ে টেবিল হেলায় না···বৈঠকে যাঁরা বসেন···

তাঁদেরই হাতের উপর স্পিরিট নিজের ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করে, তার জন্যই টেবিল হেলে, দোলে, কাৎ হয়…পায়া তুলে শব্দ করে সাড়া দেয়। যাঁরা টেবলে বসেছেন… তাঁরা যদি টেবলের উপর পরস্পরে হাত মিলিয়ে না বসতেন, তাহলে টেবলের উপর স্পিরিট নিজের ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করতে পারতো না। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের জন্য চাই আধার বা পাত্র…সেই সঙ্গে চাই আধার বা পাত্র হবে জীবন্ত—animate.

এ-সব কথা তাঁবা বলেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় প্রমাণ আর নেই !

এ তো গেল টেবিলের কথা। তারপর—

মিডিয়ামের উপর স্পিরিটের ভর হলে মিডিয়াম যখন লিখে আলাপ-আলোচনায় যোগ দেয় বা উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রদান করে…যে-লেখার নাম auto-writing…সে সম্বন্ধে শুব অলিভার লজেব কথা—It is a sort of writing which a person does being influenced by spirits. Sometimes his brain is taken possession of by this spirit and in that case he becomes unconscious and he does not know at this time of writing what he is writing. Sometimes only the fingers are taken possession of by spirits. His mind and brain remain unaffected. In this case the writer knows what he is writing, but I don't think his subconscious mind can

influence his writing at all. অর্থাৎ মিডিয়াম যখন লেখে, তখন সে নিজের খেয়াল বা ইচ্ছামতো লেখে না…স্পিরিটই তার হাত দিয়ে লেখায়। তার মস্তিষ্ক তখন স্পিরিটের অধিকারে…মিডিয়াম তখন অচেতন… কি লিখছে, সে সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই, চেতনা নেই…কি লিখছে, সে তা জানে না! কখনো কখনো এমন হয়…তার আঙুলগুলি শুধু স্পিরিটের অধিকারে …মিডিয়ামের মন বেশ সচেতন…মস্তিষ্কও সুস্থ সচেতন… মন এবং মস্তিষ্ক স্পিরিটের প্রভাবলেশহীন। এ-ক্ষেত্রে মিডিয়াম জানে বোঝে, সে কি লিখছে…কিন্তু আমার মনে হয় না যে, মিডিয়ামের অবচেতন মন তার লেখাকে কোনো রকমে প্রভাবান্বিত বা পরিচালিত করতে পারে!

মিডিয়ামের উপর স্পিরিটের যে-ভর হয় এবং ভর হলে মিডিয়ামের মুখে স্পিরিটের যে-সব কথা নির্গত হয় এবং ঐ যে auto-writing—এ সম্বন্ধে বাঙলার মনস্বী লেখক রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য দীর্ঘকাল ধরে বহু অনুশীলনাদি করেছেন। তাঁর চক্রে এক মহাত্মার স্পিরিট মিডিয়ামের মুখে auto-writing সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন, তা চিন্তা করবার যোগ্য। তিনি বলেছেন—এ-ব্যাপারে লেখক (মিডিয়াম) নিজের ভাষার সাহায্য খুব বেশী নিতে পারে না। কিন্তু ভাব যখন projected (প্রক্ষিপ্ত) হচ্ছে …তখন সেই ভাবকে সে সজ্জিত করে যোগ্য শব্দে। সেই শব্দ অনেকাংশে আমারই (স্পিরিটের) কথা। তা না হলে আমার মনের ভাব প্রকাশ পাবে কি করে? সব

কাজেই auto-writing শুনলেই অবিশ্বাস করে নাসিকা কুঞ্চন করা ঠিক নয়।

এই প্রসঙ্গে এ-স্পিরিট আরো বলেছেন

যখন তোমরা আমাদের ডাকো, তখন তোমরা হও রেডিয়োর প্রেরক-যন্ত্র (transmitter)···আর আমরা হই রিসিভার···আর যখন আমরা কথা লেখাই, তখন আমরা হই transmitter আর তোমরা হও receiver— কাজেই বুঝতে পারচো যে, তোমার মন আর আমার মন একভাবে ভাবিত না হলে···অর্থাৎ একই রকমে tuned না হলে আমার কথা তোমরা লিখতে পাবো না। Auto-writing-এর পূর্ব্বে আমরা জেনে নিই, লেখকের দৌড় কত দূর···আমরা মানুষের মনের ভিতরটা দেখতে পাই···মনের সামর্থ্য বুঝে তবে auto-writing করাই। মিডিয়ামের দেহ মন মস্তিষ্ক···যেখানে অধিকার করি···সেক্ষেত্রের কথা স্বতন্ত্র—অর্থাৎ মূর্খ মিডিয়ামের হাতেও বড় বড় কথা লেখানো চলে।

দুই

অটো-রাইটিংয়ের মূলে

পরলোক-তত্ত্ব এবং প্রেত-তত্ত্ব নিয়ে পাশ্চাত্য প্রদেশে চর্চ্চা-অনুশীলন সতেজে চলেছে। পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাসী পাশ্চাত্য-চিত্ত আজ এদিকে যে-আলোকপাত করেছে এবং করছে···তা অসাধারণ বলে স্বীকার করতেই হবে। এ সম্বন্ধে ডব্লু ষ্টেড, স্যর কোনান ডয়েল প্রভৃতি মনীষীদের গভীর গবেষণা সকলের প্রণিধানযোগ্য। সে কথার আলোচনা আমরা করবো।

এ-বিষয়ে এক সুধী পাদরী সাহেবের কথা থেকে আলোচনা সুরু করতে চাই। এঁর নাম চার্লস টুইডেল। এঁর গ্রন্থ News form the Next World পরলোক এবং প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে শুধু যে নানা কাহিনীতে পরিপূর্ণ, তা নয়... সে-গ্রন্থে তিনি এ নিয়ে যে-সব কথা লিখেছেন...সে-সব কথা বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের দল পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছেন। কি করে তিনি এদিকে মনোযোগী হলেন, সে-কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি উপভোগ্য।

১৯০০ সালের কথা। নরফোকের চার্চে তিনি কিউ-রেকটের পদ পেয়ে সেখানে আসেন। এখানকার রেক্টর সন্থ মারা গিয়েছেন...তিনি এলেন এখানকার রেক্টরিতে...সস্ত্রীক। সেদিন বৃহস্পতিবার...১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সন্ধ্যার সময় তিনি সস্ত্রীক এসে পৌছুলেন রেক্টরিতে...সঙ্গে বহু লগেজপত্র। লগেজপত্র আগের দিন এসে পৌছেছিল। এসেই তিনি মালপত্রের প্যাক খুলতে লাগলেন—রেক্টরিতে আলোর ব্যবস্থা ছিল না... একবাশ বাতি তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। প্যাক খুলতে খুলতে সন্ধ্যা হয়ে এলো...অন্ধকাব নামলো। বড় হল-ঘরে চিমনীর কার্নিশের উপর বাতি জ্বেলে খাড়া করলেন। সেই বাতির আলোয় মাল বার করছেন...আর একটা বাতি জ্বেলে খাড়া রাখলেন সিঁড়ির নীচে রেলিঙের থাম্বায়। রাত তখন আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট...তিনি তখন পাশের ঘরে চেয়ার টেবিল গুছিয়ে রাখচেন...তাঁর স্ত্রী এলেন ওদিক থেকে...এসে স্বামীকে বললেন—হানা বাড়ী। ভূত আছে গো ...হলঘরে মানুষ দেখলুম।

টুইডেল ভাবলেন, খালি বাড়ী···হয়তো চোর এসেছে! একটা লোহার রড ছিল পড়ে···সেই রডটা নিয়ে তিনি তখনি হলঘরে এলেন···এসে দেখেন, কোথায় কে? কোনো মানুষের ছায়ামাত্র নেই!

এদিকে ওদিকে দেখতে লাগলেন···হঠাৎ নজর পড়লো সিঁড়ির মাথায় দেয়ালে টাঙানো কেম্বিজের কেইন্‌স্‌ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর কেয়াসের মস্ত তৈলচিত্র। এ-গ্রামের এ-গির্জাটি তিনিই তৈরী করে দিয়েছেন···তাই তাঁর তৈলচিত্র ওখানে টাঙানো রয়েছে। এ-ছবি অমন দু-পুরুষ ধরে ওখানে টাঙানো আছে।

ছবি দেখে টুইডেল হেসে বললেন—নাও···ঐ তোমার ভূত! ঐ ছবি দেখেছো আলো-আঁধারিতে···দেখে মনে হয়েছে, মানুষ!

স্ত্রী বললেন—না, না···আমি কাণা নই···মাথাও আমার খারাপ হয়নি। আমি স্পষ্ট দেখেছি, একটা মানুষ···সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। পা তুলে নামছে···তাও দেখেছি। আর তুমি বলচো, ছবি!

টুইডেল বললেন—বেশ, ও-ছবির মানুষ আর না নামেন যাতে, ব্যবস্থা করছি।

এ-কথা বলে টুইডেল উপরে উঠে ছবিখানা সেখান থেকে নামিয়ে সেখানা নিয়ে গিয়ে রাখলেন তেতলার একটা খালি ঘরে···রেখে সে-ঘরের দরজায় তালা আঁটলেন।

তার পর শুক্রবার এবং শনিবার—স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মালপত্র বার করা এবং আসবাবপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। রাত আটটার সময় দুজনে এলেন

হলঘরে…সে-ঘরে তখন আলো জ্বলছে…তেলের আলোর ব্যবস্থা হয়েছে…তেলের আলো জ্বলছে। টুইডেল যেমন খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে এসে খাবার ঘর পার হয়েছেন… পিছনে শুনলেন শব্দ! শুনে ফিরে দেখেন, তাঁর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন! তাঁকে তুলে বুকে করে টুইডেল এলেন শোবার ঘরে·· বিছানায় তাঁকে শুইয়ে দিলেন…শুইয়ে দিয়ে শুশ্রূষা।

জ্ঞান হলো। জ্ঞান হতে স্ত্রী বললেন—লোকটাকে এখন আবার দেখলুম। স্ত্রী বললেন, হলঘর পার হয়ে সিঁড়ির কাছে যেই তিনি এসেছেন…দেখলেন, সে নেমে আসছে। স্ত্রী বললেন, মানুষটার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত পূর্ণাবয়ব দেখেছেন…ঐ ছবির মানুষ…ছবিতে তার পা তো নেই… মাথা থেকে কোমর পর্য্যন্ত ছবি!

টুইডেল চিন্তিত হলেন—সিঁড়ির মাথায় ছবি এখন নেই …ও-ছবি সরিয়ে তিনতলার ঘরে রাখা হয়েছে…কাজেই স্ত্রীর চোখের ভুল হতে পারে না! তিনি সমস্যায় পড়লেন—তাইতো! রেকটরি বাড়ীখানা তিনতলা…প্রকাণ্ড বাড়ী…অসংখ্য ঘর… তাছাড়া বড় বড় দালান…বড় বড় বারান্দা…তাঁদের চিরকাল সহরে থাকা অভ্যাস…গ্রামে এই প্রথম এসেছেন!

পরের দিন সকালে…বেলা তখন সাতটা…শুক্রবার… এখানেই একটি দাসী পেয়েছেন…বেলা সাতটায় দাসী এসে বললে—সাহেব, আমাকে ডেকেছেন?

সাহেব বললেন—কৈ, না। কে বললে, ডেকেছি?

দাসী বললে—কেউ বলেনি। ঘণ্টা বাজলো, শুনলুম… তাই ভাবলুম, ডাকচেন।

সাহেব বললেন—না…ঘণ্টা আমি বাজাইনি। ডাকিনি তোমাকে।

—মেমসাহেব ?

মেমসাহেব তখনি এলেন এ-ঘরে। টুইডেল বললেন—তুমি ঘণ্টা বাজিয়েছো…একে ডেকেছো ?

মেমসাহেব বললেন—না…ঘণ্টা আমি বাজাইনি তো…একে ডাকিওনি। আশ্চর্য্য! এ'ও তবে ভূতের কাণ্ড!

কিন্তু এর পর দিনের বেলা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শুনলেন…কতবার…ঘণ্টা বাজছে! তখন ঘণ্টার তার দিলেন খুলে…ভাবলেন, আপদের শান্তি হলো!

ঘণ্টা তো খোলা হলো…কিন্তু পরের দিন…তার পরের দিন…তার পরের দিন…পর-পর কদিন তবু বারবার ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনেন স্বামী-স্ত্রী।

তখন খবর নিয়ে টুইডেল জানলেন, রেকটরি বাড়ীর এ-মহাল অমন একশো বছর ধরে খালি পড়ে আছে…এদিকটাতে কেউ থাকতো না…চাবি-বন্ধ থাকতো…টুইডেলই এসে এদিকে থাকবার ব্যবস্থা করেছেন।

ঘণ্টা বাজা ছাড়া এক মাস আর কোনো উপসর্গ ঘটলো না…এক মাসে ঘণ্টা তাঁদের সয়ে গিয়েছে! ওখানকার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন বাড়ীর ইতিহাস। তিনি বললেন—আগে যিনি পাদরী ছিলেন…তাঁর স্ত্রী একবার নানা রকম সেলাইয়ের কাজের জন্য গ্রামের এক বর্ষীয়সী রমণীকে বাড়ীতে এনে রাখেন…রমণীটি এসেছিল তার বালিকা কন্যাকে নিয়ে। স্ত্রীলোকটি দু-চার দিন কাজ করবার পরে উঠতে বসতে শুতে দাঁড়াতে শুনতে লাগলো পায়ের শব্দ…

ভারী বুট পরে কে চলছে···এমন শব্দ! রাত্রে ঘুমোচ্ছে··· হঠাৎ জুতার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে চলছে···কার জুতার শব্দ··মানুষ দেখা যায় না! ভয়ে মেয়েকে নিয়ে এ-বাড়ী ছেড়ে সে অবশেষে পালালো।

তার পর টুইডেল-দম্পতীর চার বছর কাটলো···ঘণ্টা বাজা ছাড়া আর কোনো উপসর্গ নেই! কিন্তু একদিন এক ঘটনা।

১৯০৫ সাল···রাত্রে স্বামী-স্ত্রী ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন··· গভীর রাত···হঠাৎ ঘরের দরজায় দুমদুম করাঘাত···বেশ জোরে জোরে দরজায় ঘা পড়তে লাগলো। চাকর-বাকরের ঘুম ভাঙ্গলো···এঁরা স্বামী-স্ত্রী উঠলেন···সারা বাড়ী সন্ধান ···কারো দেখা মিললো না। এর পর বাড়ীর কমপাউণ্ডে রাত্রে মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগলো···কে যেন পায়চারি করে বেড়াচ্ছে! কোনো উৎপাত-উপদ্রব নেই বলে কেউ আর তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না।

কিন্তু একদিন রাত নটার সময় স্ত্রী এসে স্বামীকে বললেন—আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছি···নীচের তলায় এসেছি···এমন সময় কে একজন ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমার গা ঘেঁষে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল! চোর মনে করে খোঁজা হলো—রান্নাঘর···অন্য ঘর···কিন্তু কোনো ঘরে কেউ নেই!

এর পব একদিন রাত্রে···গভীর রাত্রি···হঠাৎ স্ত্রীর চীৎকারে স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্ত্রী চীৎকার করে উঠেছেন—কে? কে তুমি?

ঘরে আলো ছিল না। স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যেতে তিনি বললেন—কি হয়েছে?

. স্ত্রী বললেন—শীগ্‌গির দেশলাই জ্বালো। ঘরে মানুষ ঢুকেছে···নিশ্চয় খাটের নীচে সেঁধিয়েছে! খাটখানা উঁচু করে তুলেছিল।

ঘরের দরজা বন্ধ···মানুষ ঢুকবে কি করে? টুইডেল তখনি বাতি জ্বাললেন। বাতি জ্বেলে সন্ধান···খাটের নীচে ···আলমারির পিছনে···কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই!

স্ত্রী আতঙ্কে নীল! তিনি বললেন—খাটের এদিকটা তুলেছিল···আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল···স্পষ্ট দেখলুম, মানুষ! চীৎকার করতে গিয়ে কতক্ষণ গলায় আওয়াজ বেরুলো না! শেষে যখন গলায় আওয়াজ বেরুলো, তুমি জেগে উঠলে!

এর পরের রাত্রে স্ত্রীর আবার চীৎকার! স্ত্রী বললেন—আমার গায়ে হাতের স্পর্শ পেয়েছি···ধরেছিলুম তার হাত। লোহার মতো শক্ত হাত···কিন্তু ধরে থাকতে থাকতে হাতখানা যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল!

এর পর ক' রাত উপরি-উপরি এমনি ভয়···ও-ঘর বদলে অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা হলো···তবু সেই একই রকম উপসর্গ! ঘরে তখন থেকে উজ্জ্বল ল্যাম্প জ্বেলে রাখা হতো—কার হাতের স্পর্শ পেয়ে স্ত্রী নিত্য ঘুম ভেঙ্গে চীৎকার করে ওঠেন! একদিন তিনি বললেন স্বামীকে—আয়না বসানো বড় আলমারির আয়নায় আমি স্পষ্ট দেখেছি মানুষের ছায়া! আর এক রাত্রে তিনি দেখলেন সচল ছায়ামূর্ত্তি দেওয়ালের কার্নিশে···আর একদিন হাতের স্পর্শ পেয়ে যেমন ঘুম ভাঙ্গা···স্ত্রী দেখেন, একটা মানুষ···বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

এর ক' মাস পরে কি কাজে টুইডেলকে নিউকাশল্ অন্ টাইন সহরে যেতে হয়। সেখানে এ-কথার উল্লেখ করতে তিনি শুনলেন, সে-সহরে পারলৌকিক তত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করেন এমন কজন সুধীর বাস। এঁদের একজনের সঙ্গে হলো তাঁর পরিচয়। ভদ্রলোকের নাম রবিনসন…তাঁর বইয়ের দোকান। নিজের নাম-ধাম না বলে টুইডেল এ-ঘটনার উল্লেখ করেন। শুনে সে-ভদ্রলোক মিডিয়াম চক্র করে বসলেন এবং মিডিয়াম সাহায্যে শোনা গেল, ওটি রেক্টরির প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর কেয়াসের স্পিরিট…তিনি বন্ধু…ভয়ের কোনো কারণ নেই টুইডেলদের …আপদে বিপদে তিনি রক্ষা করবেন।

এ-ঘটনার পর থেকে টুইডেল স্থির করলেন, পারলৌকিক তত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করবেন। সেজন্য তিনি এ সম্বন্ধে বই পড়তেন আর যাঁরা এ-তত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করেন…এমন কজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

এর পর টুইডেল বদলি হয়ে ওয়েষ্টন ভিকারেজে আসেন ১৯১০ সালে। ইতিমধ্যে চক্রবৈঠক নিয়ে তিনি বহু অনুশীলন করেছেন এবং পরলোক আর পরলোকগতদের সম্বন্ধে তাঁর মনে বিশ্বাস হয়েছে বেশ সুদৃঢ়! নিয়মিতভাবে তিনি চক্রবৈঠক করেন এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার… বিনা-বৈঠকেও তাঁর গৃহে নানা স্পিরিটের আবির্ভাব হয়… তিনি, তাঁর স্ত্রী নানা ছায়ামূর্ত্তি দেখেন! দেখে ভয় হয় না কারো…মনের ভাব এমন যে এরা স্বজন-বন্ধু!

বিনা-বৈঠকে প্রায় ছায়ামূর্ত্তি দেখেন…কথা শোনেন…

গান-বাজনা শোনেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরিতে তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারের বর্ণনা লেখেন।

১৯০৯ সালের ৩১শে মে তারিখের ঘটনা তিনি লিখেছেন তাঁর ডায়েরিতে—রাত দুটো...শিশুকন্যা ডোরোথি...এক মাসের শিশু...তার কান্না...স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে যায়...স্ত্রী জেগে বসলেন...আমাকে ডাকলেন। আমি জেগে বললুম—কি হলো? স্ত্রী বললেন—বাজনা শুনচো? কি চমৎকার বাজাচ্ছে! শুনলুম, আমারি বাড়ীতে বসবার ঘরে বাজনা বাজচে...মিউজিক-বক্সে যেমন বাজনা শোনা যায়... অবিকল তেমনি! অপূর্ব্ব মধুর! একটি গৎ দু-দুবার বাজলো...তারপর বাজনা থামলো। বাজনা থামতে সে-ঘরে গেলুম...না মানুষ, না বাজনা! আমার বাড়ীতে মিউজিক-বক্স নেই...ছিল না কোনোদিন।

১৯০৯...১৮ই অক্টোবর ডায়েরিতে লেখা—আমি কাজে বেরিয়েছিলুম...আমার বসবার ঘর ছিল তালাবন্ধ। বাড়ী ফিরে আসতে স্ত্রী বললেন—ও-ঘরে কে চমৎকার বেহালা বাজাচ্ছিল...শুনে গিয়ে দেখি, ঘরে তালা বন্ধ... সার্শি দরজা সব বন্ধ। তুমি বাড়ী নেই...কে বাজায়? বেহালা যা শুনলুম...যেমন পাকা হাত, তেমনি মিষ্ট মধুর!

১৯১০...২৪শে অক্টোবর—আজ সকালে ছায়ামূর্ত্তি দেখেছি ...পুরুষের মূর্ত্তি।

বৈকালে তিনটার সময়—আমার বসবার ঘরে বসে আমি লেখাপড়া করছি...আমার পিছনে বাজলো বেহালা...কদিন উপরি-উপরি অনেক জিনিষ চোখে প্রত্যক্ষ করছি। বেহালা প্রায় শুনি।

বেলা চারটার সময় আবার দেখি ছায়ামূর্ত্তি···আমার বসবার ঘরে···ঘরে তখন শুধু আমি একলা। মৃদুভাবে তাকে জানালুম ধন্যবাদ···বললুম—বেহালায় এমন মিষ্ট হাত বড় দেখা যায় না। আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী এলেন ঘরে···এসে বললেন—আমার বসবার ঘরের দরজায় ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়িয়ে···স্ত্রী দেখলেন দূর থেকে···এ-ঘরে আসবার সময়।

এ-প্রসঙ্গে টুইডেল লিখেছেন—টুইডেল নিজে বেহালা বাজান···ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বেহালা বাজাবার সখ। মধ্যে বেহালা প্রাকটিশ ছেড়ে দিয়েছিলেন—এখন ভূতের বেহালা শুনে আবার তিনি নূতন করে বেহালা ধরলেন। কিন্তু বেহালায় তাঁর হাত কোনোদিন খোলেনি···এখনো তেমন খুলছিল না···মাসখানেক বেহালায় চর্চ্চা করে তিনি বেহালা-অভ্যাস ত্যাগ করেন।

এর পর জানুয়ারি মাসে একদিন···২৭শে জানুয়ারি—স্ত্রী এলেন তাঁর বসবার ঘরে···এসে বললেন—কাজ করছিলুম ···কে এসে কাণের কাছে বললে—যাও, চার্লসকে গিয়ে বলো ···বেহালা অভ্যাস করুক!

স্ত্রী শুধু কণ্ঠ শুনলেন·· কথা যে কইলো, তাকে দেখলেন না! এমন মাঝে মাঝে ঘটে···স্ত্রী অনেক সময় এমন কণ্ঠস্বর শোনেন। ও-কথা শুনে স্ত্রী প্রশ্ন করলেন—কি অভ্যাস করতে বলবো?

জবাব হলো—বেহালা।

স্ত্রী বললেন—ওঁর হাত খুলছে না তেমন।

জবাব হলো—আমি বাজাবো···আমার সঙ্গে বাজাবে।

এর পর থেকে টুইডেল বেহালার গৎ শুনতে লাগলেন... সকালে এবং রাত্রে...শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেহালা প্রাকটিস করতে লাগলেন এবং এখন থেকে শুধু বেহালা শোনা নয়... ছায়ামূর্ত্তির দর্শন ঘটতে লাগলো তখন সারাক্ষণ! এ সম্বন্ধে টুইডেল লিখেছেন—

The apparition is a most amazing affair and of its reality there can be no manner of doubt.—আশ্চর্য্য এ-মূর্ত্তি ··তার সম্বন্ধে সংশয়ের বিন্দুবাষ্প নেই! আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার কন্যা, বাড়ীর দাসদাসী·· সকলে দিনে-দুপুরেও এ-ছায়ামূর্ত্তি দেখছেন··· বাড়ীর সর্ব্বত্র তার বিচরণ। কে এ-মূর্ত্তি···তা আমরা কেউ নির্দ্ধারণ করতে পারি না!

তিন

অটো-রাইটিং

অনেকেই বলেন, টেবিলের পায়া ঠোকা থেকে পরলোক-গত আত্মার সঙ্গে খবরের আদানপ্রদান চললেও···টেবিলে এ-আদানপ্রদানের সীমা যেমন খানিকটা বাঁধা থাকে, তেমনি পরলোকগত আত্মার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অপ্রত্যক্ষে চলার দরুণ মনে সম্পূর্ণ তৃপ্তি মেলে না। সে-তৃপ্তি পাওয়া যায় মিডিয়ামে যখন আত্মার ভর হয়···কিংবা অটো-রাইটিংয়ে।

টেবিল-চক্র ছাড়া টুইডেল প্ল্যাঙ্কেট নিয়েও বৈঠক বসাতেন। এবং প্ল্যাঙ্কেট করার পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রী অলৌকিক ভাবে এই প্ল্যাঙ্কেটের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

১৯১৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সকালে ঘুম থেকে

উঠে স্ত্রী বললেন টুইডেলকে—রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন··· যদি প্লাঞ্চেট নিয়ে বসেন, তাহলে আত্মার হস্তাক্ষরে প্রশ্নোত্তর আদানপ্রদান চলবে। সঙ্গে সঙ্গে প্লাঞ্চেটের ব্যবস্থা হলো এবং প্লাঞ্চেটে স্পিরিটের লেখার দেখা মিললো। প্লাঞ্চেটে···টুইডেল বলেন—দুজনের বসা উচিত···কেন না, একজন বসলে তাঁর হাতের পেন্সিলে যে-লেখা হবে··· হয়তো সে-লেখায়···যিনি বসেছেন···তাঁর ইচ্ছাশক্তির জন্যই মনোমত অক্ষর বেরুতে পারে ; তা না বেরুলেও মনে সংশয় থাকতে পারে! এজন্য দুজনের বসা উচিত প্লাঞ্চেটে! তাহলে যাঁর হাতে এ লেখা ফুটবে···তাঁর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ-সম্বন্ধে সংশয় থাকবে না।

প্লাঞ্চেটে তাঁদের বালিকা কন্যা ডোরোথিও অনেক সময় বসতে লাগলেন মায়ের সঙ্গে এবং ডোরোথির হাতের পেন্সিলে যে-লেখা ফুটতে লাগলো, সে-লেখার ভাব-ভাষা ···মায় বাক্যের বানানগুলো পর্য্যন্ত ডোরোথির সে-বয়সে জানা বা আয়ত্তে থাকার কথা নয়।

একদিন ডোরোথি বসেছে মায়ের সঙ্গে প্লাঞ্চেটে··· হঠাৎ ডোরোথির পেন্সিলে লেখা বেরুলো যে, সামনের এপ্রিল মাসে টুইডেলের বহু অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে। প্রশ্ন হলো—কে দেবে এ-টাকা? পেন্সিলের লেখায় জবাব মিললো—একজন মিশরী (An Egyptian)। কথা শুনে সকলে অবাক! টুইডেলের সঙ্গে কোনো মিশরীর আলাপ-পরিচয় নেই···হঠাৎ মিশরী তাঁকে টাকা দেবে কেন?

এবং এ-বৈঠকের কদিন পরে···৩১শে মার্চ্চ তারিখে··· প্লাঞ্চেটে ডোরোথি পেলো দুঃসংবাদের আভাস। লেখা

ফুটলো—আমি তুতানখামেন…আমি দণ্ড দিতে রেয়াৎ করি না…একটা মৃত্যু আসন্ন। ডোরোথি সভয়ে প্রশ্ন করলে—কিন্তু আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি…দণ্ড দেবেন কেন? জবাব মিললো—মিশরে গিয়ে তোমরা সমাধিস্তূপ ঘেঁটেছিলে।

(এ-ঘটনার কিছু আগে এঁরা সপরিবারে এবং আরো অনেকের সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলেন…গিয়ে সেখানে সমাধি-স্তূপ দেখেছিলেন।) ডোরোথি প্রশ্ন করলে—কদিন আগে যে মিশরীর কথা বলেছিলে…সে কি তুমি? জবাব মিললো—হ্যাঁ।

এর দুদিন পরে প্লাঞ্চেটে খবর মিললো—যা বলেছি, প্রস্তুত থেকো। একটা মৃত্যু। সঙ্গে সঙ্গে নাম ফুটলো ইংরেজী হস্তাক্ষর—তুতানখামেন!

এইদিনই বৈকালে ডাকে টুইডেল পত্র পেলেন…মিশরী-অভিযানে সহায়ক ক্যাপটেন ভশনের এটর্ণির কাছ থেকে। এটর্ণি লিখেছেন—টুইডেলের হাতে ক্যাপটেন ভশন বহু অর্থ দিয়েছেন…তাঁর ইচ্ছামতো সে-টাকা টুইডেল সৎকার্য্যে ব্যয় করবেন।

টুইডেল বলেন—এ-টাকার সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রত্যাশা ছিল না…হঠাৎ এ-টাকা পাওয়া গেল! মৃত্যুর আভাস… তার অর্থ—ক্যাপটেন ভশন ছিলেন অভিযাত্রীদের অধ্যক্ষ… মিশরে গিয়ে তিনিই সমাধি স্তূপ ঘেঁটেছিলেন। ডোরোথি প্লাঞ্চেটে মৃত্যুর সংবাদ পায় যেদিন…তার দুদিন পরে ক্যাপটেন ভশনের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দলিল লিখে টুইডেলকে টাকা দেবার ব্যবস্থা করে যান! ক্যাপটেন

ছিলেন ওরিয়েণ্টালিষ্ট…প্রত্ন তত্ত্বের অনুশীলন করতেন তিনি।

এ-ঘটনার কথা প্রচারিত হলে প্ল্যাঞ্চেটের উপর বহু লোকের আস্থা হলো এবং অনেকেই টুইডেলের সঙ্গে দেখা করে, পত্র লিখে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন।

আমাদের দেশে রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয় পরলোকতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। তিনি স্পিরিটকে প্রশ্ন করেছিলেন—কোনো নিরক্ষর মানুষ মারা যাবার পর তাঁর স্পিরিটকে আনিয়ে তাঁকে দিয়ে auto-writing সম্ভব কি না? এ-প্রশ্নের জবাব তিনি পেয়েছিলেন—পারা যাবে। কারণ সে-ও তো চিন্তা করছে…তার সেই চিন্তাই projected হয়ে লেখকের আঙুলে আসবে। সেই সঙ্গে স্পিরিট এ-কথাও বলেছিলেন—all spirits cannot make auto-writing. সকল স্পিরিট অটো-রাইটিং করতে পারে না।

এ-সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয় বহু স্পিরিটের সঙ্গে আলোচনায় যে-তথ্য সংগ্রহ করেছেন…তার মর্ম্ম সঙ্কলিত করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সে-সব তথ্য: কোনো কথা জানা বা না-জানার সঙ্গে auto-writing-এর কোনো সম্পর্ক নেই। স্পিরিট যে-কথা লেখেন, সেগুলি তাঁর কথা…যিনি লিখচেন, তাঁর অবচেতন মনের কথা তা নয়! স্পিরিট যখন auto-writing করায়, তখন আগে থেকেই লেখকের সে-কথা জানা থাকুক বা না থাকুক…স্পিরিট তা জানে এবং যতটুকু জানে, ততটুকুই সে লেখায়…লেখকের মনের কথা লেখায় না! লেখক যতক্ষণ লেখে, ততক্ষণ লেখকের

অবচেতন মনের কোনো কথা আপনা থেকেই ভেসে উঠে লেখকের মনে তখন আসতে পারে না। এর কারণ সম্বন্ধে আচার্য্য জেমসের স্পিরিট বলেছেন—The reason is that subconscious mind is always inactive and inoperative when the conscious mind is working. When you are writing, it is the conscious mind that is working—অর্থাৎ যিনি যখন লিখছেন…তখন তাঁর চেতন মনই এ-লেখা লিখছে!

রাজেন্দ্রলাল প্রশ্ন করেছিলেন—লেখকের যদি তেমন বিদ্যাসাধ্য না থাকে তাহলে তাকে দিয়ে কি লেখাতে পারেন?

জবাব: না। সেটা অসম্ভব ব্যাপার। লেখক লেখাপড়া জানা লোক হওয়া চাই। তার মনের মধ্যে আমি যে-ভাষা চালিয়ে দিচ্ছি, সেটা ধরে রাখবার মতো তার বুদ্ধি-বিবেচনাও চাই। সে যাতে অঙ্গুলি সংযোগে লিখতে পারে, ততটুকু বিদ্যা অন্ততঃ তার থাকা চাই। এ ছাড়া সব রকম স্বৈরলিপি (auto-writing) অসম্ভব। কিন্তু সেই রকম একজন লোককে যখন আমরা অচেতন করে ফেলি, তখন আমরা তার মস্তিষ্ক, ফুশফুশ, মাংসপেশী প্রভৃতি আয়ত্তের মধ্যে লই। তখন তার আঙুলের ভিতর দিয়ে একটা কলম ধরে আমরা কিছু লিখে দিতে পারি…কিন্তু সে-সময় তাকে থাকতে হবে অচৈতন্য হয়ে…সুতরাং সে-লেখা ঐ লেখকের হয় না—এটা হয় সেই স্পিরিটের…আত্মিকের…যে লেখায়। যেক্ষেত্রে লেখকের অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থা ঘটে, তখনো মনের সেই একই অবস্থা হয়। আমরা তার মাংসপেশী এবং আঙুলগুলি

আমাদের প্রভাবের মধ্যে এনে লিখে চলে যাই। সেই অর্দ্ধ-অচৈতন্য মিডিয়ামটি তখনো কিছু লেখে না। * * *

প্রশ্ন: যে ভাষা আমি জানি না…সেই ভাষায় স্বৈরলিপি করাতে পারেন?

জবাব: না…তা সম্ভব নয়। আপনি যে ভাষা জানেন না…সে-ভাষায় আমি আপনাকে দিয়ে লেখাতে পারি না। অচেতন অবস্থায় স্বৈরলিখনে সেটা সম্ভব হতে পারে …কারণ তখন আমিই লিখবো…আপনি তো লিখবেন না।

আর এক স্পিরিট তাঁকে বলেন—তোমরা স্পিরিটদের projection-এর জন্য লেখো। সমস্ত ব্যাপারটাই হয় যেন মেকানিকাল…যন্ত্রচালিতবৎ তোমরা লেখো। লেখার জন্য তোমাদের মনে কোনো volition থাকে না। এবং আঙুল-গুলোও আমাদের কর্ত্তৃত্বে চলে। সেখানেও volition নাই… সবই হয়ে পড়ে মেকানিকাল।

এ-শক্তি লাভের সম্বন্ধে মিডিয়ামকে স্পিরিট বলেছেন—এ-শক্তি অল্পদিনের চেষ্টায় হবার নয়…gradual development. একটা বীজ বসালেই প্রাকৃতিক বিধানে তা থেকে গাছ হয়। কিন্তু মালী যদি সে-জমির যথেষ্ট তদ্বির করে এবং গাছে আলো-বাতাস লাগে…গাছ যদি তার পুষ্টির যোগ্য আহার পায়…তাহলে প্রকৃতির বিধানে সে-গাছের বাড় হয় ক্ষিপ্র। গাছটা টপ করে বেড়ে ওঠে। auto-writing ব্যাপারও তেমনি। নিরন্তর সাধনা করো। দেখবে, শক্তি অল্পদিনেই জেগে উঠেছে। শস্তায় কিস্তিমাত হয় না। এ-ব্যাপার হলো যোগক্রিয়া। বিশ্বাস রেখে পথে এগিয়ে যেতে হয়।

এ-কথা খুব সত্য—নিরন্তর সাধনায়…টেবিল-টার্ণিং বলুন, প্লাঞ্চেট বলুন—এগুলোয় আমি নিজে প্রত্যক্ষ ফল পেয়েছি। মিডিয়াম-যোগে স্পিরিটের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান এবং auto-writing…এ সবই সহজ এবং দ্রুত হয় নিত্যনিয়ত সাধনার ফলে। এ নিয়ে যাঁরা অনুশীলন করেন, তাঁদের সকলেরই এই এক মত!

Auto-writing-এর পর মিডিয়াম-সাহায্যে স্পিরিট নামাবার কথা আসে। যাঁরা এ-নিয়ে আরো গভীরভাবে সাধনা করেন, তাঁরা বলেন—মিডিয়াম সাহায্যে স্পিরিটের সঙ্গে সংযোগ তো সামান্য ব্যাপার…স্পিরিটকে দেখা যায় এবং তাঁদের ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত নেওয়া সম্ভব হয়। সে সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচনা করবো। তার আগে গোটাকতক ভৌতিক কাহিনীর উল্লেখ করতে চাই।

চার

পরলোকের জীব

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা…আমরা তখন কলেজে পড়ি। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমারের ছিল অধ্যাত্মতত্ত্বে সুগভীর অনুরাগ এবং পারলৌকিক ব্যাপারের তিনি অনুশীলন করতেন একান্ত নিষ্ঠাভরে। একান্ত নিষ্ঠা আর সাধনার ফলে তাঁর পরিবারে…তাঁর আত্মীয়-বন্ধু সমাজেও পরলোকের সঙ্গে চমৎকার মিতালীর সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়েছিল।

শিশিরকুমারের উদ্যোগে সেখানে নিত্য-নিয়মিত বসতো

সাইকিক সমিতির বৈঠক এবং সে-বৈঠকে যে-সব ব্যাপার হতো...সেগুলির মধ্যে বিশেষ কাহিনীগুলি শিশিরকুমারের স্পিরচুয়া'ল ম্যাগাজিনে নিয়মিত প্রকাশিত হতো এবং সেই পত্রিকায় নানা জনে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতাদির কথা লিখে পাঠাতেন। সে-সব বিবরণ যথারীতি পত্রিকায় ছাপা হতো...তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে শিশিরকুমার বা তাঁর যোগ্য প্রতিনিধিরা গিয়ে বহু বিচিত্র ব্যাপারের তত্ত্ব সংগ্রহ করতেন। সে-বৈঠকে ছু-একবার যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

সে-সময়কার কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী বলছি। সে-সব কাহিনী থেকে জানা যাবে, ইহলোক থেকে বিদায়-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না...পরলোকগত বহু ব্যক্তির প্রেতাত্মা ইহলোকে বিচরণ করে। এ-সব জীবের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক প্রেতাত্মা অনিষ্ট করে, উপদ্রব করে... বেশীর ভাগ কিন্তু ইহলোকের আত্মীয়-স্বজনের উপকার করতে বিমুখ থাকেন না!

আমার ছোটবেলার একটি কাহিনী দিয়ে এ-প্রসঙ্গ স্বরু করি।

আমাদের বসত-বাড়ীতে (ইছাপুর গ্রামে...নবাবগঞ্জ ইছাপুর) আমরা শুনতুম—কোন্ পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার অধিষ্ঠান ছিল। বিপদ-আপদের আশঙ্কা থাকলে...স্বপ্নে বা কণ্ঠের স্বরে তার আভাস পাওয়া যেতো এবং শুনেছি—বাড়ীর অনেকে রাত্রে খড়ম পায়ে চলার শব্দও নাকি শুনতে পেতেন ...চক্ষে কেউ কাকেও দেখেননি।

আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। শুনেছি—আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের (এ-ভাইয়ের বয়স তখন দশ

বছর) খুব বেশী অসুখ করে। তখনকার দিনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হয়েছিল চূড়ান্ত রকম··কলকাতায় তখন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন স্যালজার সাহেব···তাঁকে নিয়ে যাওয়া হতো ইছাপুরে। দু-তিন মাস রোগে ভোগার পর ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিলেন। তাঁর বিধবা মা রাত্রে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের ঠাকুরঘরের দোরে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়েন। ঠাকুরকে ডাকছেন···প্রাণ ভরে···হঠাৎ শুনলেন পিছনে খটখট খড়মের শব্দ। তার পর শুনলেন কণ্ঠস্বর··· আমার পিসিমাকে ডাকছেন। পিসিমা উঠে বসলেন···বসে কাকেও দেখলেন না···শুনলেন শুধু কণ্ঠস্বর। শুনলেন— কাঁদিস নে···ছেলে বাঁচবে। আঁচল পাত···যে-জিনিষ দেবো, ছেলের মুখে দিগে যা এখনি গিয়ে···সুরাহা হবে।

পিসিমা আঁচল পাতলেন···বাতাসে আঁচল পাতা··· আঁচল পাতবামাত্র আঁচলে পড়লো একখানি বাতাসা···সঙ্গে সঙ্গে খড়মের খটখট শব্দ! সে-শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। পিসিমা ভাবলেন, স্বপ্ন···কিন্তু না, আঁচলে বাতাসা! তিনি সেই বাতাসা এনে ছেলের মুখে দিয়েছিলেন এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্য কথা— বেহুঁশ ছেলে বিছানায় পাত হয়ে পড়ে আছে ··মুখে কথা ফোটে না···শেষ-রাত্রে সে-ছেলে ডাকলো—মা···

মা বললেন—কেন, বাবা ?

ছেলে বললে—জল খাবো।

মা তাকে জল খাওয়ালেন এবং ছেলে সে-যাত্রা বেঁচে উঠলো।

এমন আরো দু-তিনটি ঘটনার কথা আমি শুনেছি··· বইয়েও পড়েছি।

ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদে রাণী এলিজাবেথের স্পিরিট এখনো আছে। রাজবংশের কারো বিপদ-আপদ কিম্বা রাজ্যের কোনো বিপদ-আপদের আশঙ্কা থাকলে সে-ছায়ামূর্ত্তি দেখা যায়…এ-ঘরে ও-ঘরে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে! এই সময়ে ছাড়া সে-ছায়ামূর্ত্তি নাকি আর কখনো দেখা যায় না!

আলিপুরের হেষ্টিংস হাউস (আলিপুরের জর্জ-কোর্টের পূর্ব্বগায়ে) মস্ত কমপাউণ্ডওয়ালা প্রকাণ্ড প্রাসাদ। এখানে গভীর রাত্রে অনেকে শুনেছেন জুড়ি-গাড়ী চলার শব্দ। সে-শব্দ গাড়ীবারান্দা পর্য্যন্ত এসে থামলো…তার পর অনেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সে-গাড়ীর দরজা খুলে নামলো সাহেব মেম! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া সাহেব মেম সব চকিতে বাতাসে মিলিয়ে গেল! এ-কাহিনী আমাদের তরুণ বয়সে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শী বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক লিখে ছাপিয়েছিলেন।

এখন বলি একটি ভূতুড়ে গল্প…সত্য ঘটনা বলে এ-কাহিনী ছেপে বেরিয়েছিল ১৯০৮ সালে শিশিরকুমার ঘোষের হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে—ভাগলপুরের সরকারী হাসপাতালের এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জনের কোয়ার্টার্সের ব্যাপার।

যিনি তখন ও-হাসপাতালের ডাক্তার…তিনিই ঘটনার কথা সবিস্তারে উক্ত পত্রিকায় লিখে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পত্রের মর্ম্ম সঙ্কলন করে দিচ্ছি—

১০ই অক্টোবর, ১৯০৮

আমার বাড়ীতে এক ভৌতিক ঘটনা ঘটছে…তার আকস্মিকতায় এবং বৈশিষ্ট্যে আমরা স্তম্ভিত! কি করে এ-দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবো…আপনার কাছে পরামর্শ প্রার্থনা

করি। এ-ব্যাপারে শুধু বিরক্তি নয়…রীতিমত ভয় হয়েছে এবং বাধ্য হয়ে হাসপাতালের বাসা ত্যাগ করে অন্য বাসায় আমি সপরিবারে বাস করছি।

ঘটনার কথা…ডাক্তার লিখছেন—হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে আমার কোয়ার্টার্স। বাসায় থাকি আমি, আমার স্ত্রী, দুটি ছেলেমেয়ে এবং আমার বিধবা বৌদি। এখানে আজ পাঁচ বৎসর আমি কাজ করছি।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বুধবার…রাত তখন আড়াইটে… আমার ঘরের পাশের ঘরে থাকেন আমার বৌদি…সকলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে শুই…ও-রাত্রে আড়াইটের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল…বৌদির ঘরের দরজায় দুম্‌দাম্‌ করাঘাতের শব্দে। আমরা ভাবলুম, চোর এসেছে। লাঠি-সোঁটা আর লণ্ঠন নিয়ে বেরুলুম! চারিদিকে সন্ধান করলুম—কোথায় কে? কারো চিহ্ন দেখলুম না! পরের দিন রাত্রে ঠিক ঐ সময়েই বৌদির দোরে আবার তেমনি দমাদ্দম ঘা! তখন ও-মহল্লায় চোরের উৎপাত চলেছিল—রাত্রে আমরা সকলে হাসপাতালের লোকজন সমেত চারিধারে আবার সন্ধান করলুম…কিন্তু কারো চিহ্ন নেই।

তিনদিনের দিন রাত্রে সকলে সজাগ থাকবো, সঙ্কল্প করেছিলুম…কিন্তু সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ইট-পাটকেল পড়তে লাগলো…সারা দিন…সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। মাঝে মাঝে ইট-পাটকেল পড়ছে…কে ফেলছে…কোথা থেকে ফেলছে…সকলে বহু চেষ্টাতেও দেখতে পাই না! আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার, এত ইট-পাটকেল পড়ছে… কোনোটা কারো গায়ে পড়ছে না…মানুষজনকে বাঁচিয়ে পড়ছে।

সারাদিনে পঞ্চাশ-ষাটটা পাটকেল পড়েছিল। সন্ধ্যা হতেই সব ঘরের দরজায়-জানলায় দুমদাম করাঘাতের শব্দ। সকলের মনে হলো, মানুষের কাজ নয়…নিশ্চয় ভৌতিক ব্যাপার! কিন্তু হঠাৎ এতকাল পরে ভূতের উৎপাত কেন—এ-সমস্যার মীমাংসা হয় না! যাই হোক, রাত্রে নিজেরা সজাগ রইলুম—চাকর বামুন হাসপাতালের কজন লোক…সকলে মিলে রাত দুটো পর্য্যন্ত লাঠি সোঁটা আর লণ্ঠন জ্বেলে বসে চৌকিদারী করলুম—সে-রাত্রিটা আমাদের বারান্দায় কাটলো।

বারান্দায় বসে বসে শুনছি, ঘরগুলোর দরজায় পালা করে করে ঘা পড়ছে। যে-দোরে শব্দ হয়…আমরা ছুটে যাই…কিন্তু কোথায় মানুষ, কোথায় কে? এ-দোরের সামনে গিয়েছি…সঙ্গে সঙ্গে অন্য দরজায় ঘা পড়ে। সারা রাত ছুটোছুটি করে কাটলো।

পরের দিন চার-পাঁচজন লোক জুটলো…চৌকিদারীর কাজে—তাদের দুজনের হাতে বন্দুক। কতবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হলো…কিন্তু ফল একই…অর্থাৎ এ-দোরে, ও-দোরে ঘা পড়ে। সাত-আট রাত্রি এমনভাবে কাটবার পর বাসা ছেড়ে অন্য বাসায় আশ্রয় নিলুম। বাসা বদলানো মানে, পুরানো বাসায় খাওয়াদাওয়া করি…রাত্রে নতুন বাসায় গিয়ে শুই। পুরানো বাড়ীতে ইট-পাটকেল পড়ে না…নতুন বাসাতেও না! কিন্তু শেষে এক কাণ্ড—পুরোনো বাসায়…বৌদি বিধবা মানুষ…তিনি যখন গিয়ে রান্না করে খাওয়াদাওয়া করেন…তখনই শুধু ও-বাড়ীতে ইট-পাটকেল পড়তে থাকে—আমরা যখন যাই…তখন পড়ে না।

নতুন বাসায় দু-তিন দিন মাত্র শান্তি ছিল…তারপর রাত্রে নতুন বাসার ঘরের দোরেও আবার তেমনি ঘা পড়তে লাগলো। এ-ঘা পড়ে শুধু বৌদির ঘরের দরজায়। দু-রাত্রি এমনি ঘটবার পর তৃতীয় রাত্রে ঘর বদলানো হলো—অর্থাৎ আমরা যে-ঘরে শুই…সে-ঘরে শুলেন বৌদি… আর বৌদির ঘরে শুলুম আমরা স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে। ভেবেছিলুম, আমরা যে-ঘরে শুয়েছি…সেই ঘরের দরজায় ঘা পড়বে…কিন্তু তা নয়…ও-ঘরে বৌদি শুয়েছেন …তাঁর ঘরের দরজায় ঘা পড়তে লাগলো। নতুন বাসায় ইট-পাটকেল পড়লো না…ইট-পাটকেল পড়তে লাগলো পুরোনো বাসায়…তাও শুধু বৌদি যখন ও-বাসায় যান, তখন মাত্র !

নতুন বাসায় পাঁচ-ছদিন থাকবার পর দরজায় ঘা পড়ায় ঘটলো একটু বৈচিত্র্য। প্রথমে মৃদু করাঘাত স্থরু হলো…তারপর বেশ জোরে জোরে…এমন জোরে এবং এমন রুদ্রতালে যে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়! তার পর যে-ঘরের আলমারিতে কাপড়-চোপড় আছে…সে-আলমারির কপাটে ঘা পড়তে লাগলো…একেবারে ঘরের মধ্যে! এ-খবর এমন রাষ্ট্র হলো যে অনেকে আসতে লাগলেন কৌতূহলী হয়ে। সকলে দেখেন …শোনেন…চিন্তা করেন…কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হতে পারে কি করে…কেউ কোনো উপায় বাতলাতে পারেন না!

আরো দু-চারদিন পরে উপসর্গ বাড়লো। মশারি খাটিয়ে শুয়ে আছি…মশারি দুলতে লাগলো… যেন ঝড়ো বাতাসের দোলায় দুলছে! সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইতে থাকে ঘরে…অথচ জানলা-খড়খড়ি বন্ধ। বিছানায়

হাতপাখা থাকে···হঠাৎ দেখি, সেগুলো নড়ে সরে বিছানা থেকে মেঝেয় পড়লো !

এ-ব্যাপারের কি অর্থ—দয়া করে জানাবেন কি ?

এ-চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছিল পত্রিকার তরফ থেকে। জবাবে লেখা হয়েছিল—কোনো আত্মীয়ের প্রেতাত্মার কাজ··· তবে তার কোনো দুরভিসন্ধি নেই···কোনো অনিষ্ট করতে সে চায় না। আপনাদের সঙ্গে খবরাখবর লেনদেন করতে সে চায়···মনে হচ্ছে। কি করে তা হতে পারে··· জবাবে সে-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এ-জবাবের পর ২০শে অক্টোবর তারিখে ডাক্তার আবার চিঠি লিখলেন ম্যাগাজিন-পরিচালকদের। এ-চিঠিতে তিনি লিখলেন—

আপনার উপদেশমত নূতন বাড়ীতেই দিন-রাত আছি ···পুরোনো বাসায় যাই না···এ-কদিন পুরোনো বাসায় কিছু হয়নি···কাজেই আবার পুরোনো বাসায় এসেছি। আসবার সঙ্গে সঙ্গে দিনের বেলায় বাড়ীর ছাদে ছ-সাতটা পাটকেল পড়লো···এবং ঘরের মধ্যে তিন-চারটে পাটকেল— ঘরের দরজায় দু-তিনবার ঘা পড়লো···দিনের বেলায় শুধু··· রাত্রে নয় !

তিনদিনের দিন নতুন কাণ্ড। এ পর্য্যন্ত ইট-পাটকেল পড়া, দরজায় ঘা মারা চলতো···কারো শরীরে জখম নয়··· বা অন্য উৎপাত ছিল না—এখন ভূত বেশ রঙ-তামাসা চালাতে সুরু করেছে। ঘরে সকলে বসে কথা কইছি···দরজা খোলা ···হঠাৎ দুদ্দাড় শব্দে দরজা হলো বন্ধ···আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বৌদির গায়ে অদৃশ্য হাতের কিল-চড়। আমরা চোখে

কিছু দেখছি না…কিন্তু কানে শুনছি কিল-চড়ের শব্দ এবং চোখে দেখছি বৌদির যাতনা এবং কানে শুনছি তাঁর চীৎকার। আমার স্ত্রীও দু-চার ঘা কিল-চড় খাচ্ছেন—তবে বৌদির গায়ে যে-রকম জোরে কিল-চড় চলে, তাঁর গায়ে তেমন জোরে নয়।

একদিন হঠাৎ দিনের বেলায় ঘরের ছাদ ফুঁড়ে একটা ওল পড়লো মেঝেয়। বৌদি খেতে বসছেন…হঠাৎ তাঁর সামনে এলো বাতাসে উড়ে একহাঁড়ি ছাই · ছাইয়ের হাঁড়ি বৌদির পাতের কাছে এমন ভাবে রাখা হলো…যেন কে হাঁড়িটা সাবধানে এনে মেঝেয় নামিয়ে রাখলো! এইখানেই হাঁড়ির ব্যাপারের ইতি নয়! আমার স্ত্রী এবং বৌদি…তুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন…তাঁদের চোখে পলক পড়তে-না-পড়তে হাঁড়িটি আপনা থেকে কাৎ হলো, উপুড় হলো এবং তার ভিতরকার রাশীকৃত ছাই যেন কে ঢেলে রাখলো সেখানে এবং ঢেলে রাখা মাত্র হাঁড়ি সচল হয়ে সরে…উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! মানুষজন বা মানুষের ছায়া-মাত্র লক্ষ্য হলো না কারো!

তার পর বৌদি কোনো মতে খাওয়া সেরে উঠলেন—যেমন আঁচানো শেষ…কোথা থেকে একরাশ আলুর খোশা পড়লো তাঁর গায়ে…যেন আকাশ থেকে ঝরে! মাঝে মাঝে বেলপাতা ঝরে পড়ে বৌদির মাথায়।

তার পর হঠাৎ সেদিন রাত্রে বৌদি স্বপ্ন দেখলেন—এক ব্রাহ্মণ এসে বললে—তুমি যদি বলো, তোমার সঙ্গে বাড়ীতে ঢুকতে তাহলে বাড়ীতে ঢুকবো। তুমি যদি বারণ করো… তাহলে ঢুকবো না…চলে যাবো।

তাঁর ঘুম ভেঙে গেল…গায়ে কাঁটা…তিনি এসে আমাদের

ডাকলেন এবং এ-কথা বললেন। আমরা নীরবে শুনলুম ...কোনো জবাব দিলুম না। কি জবাব দেবো ?

সে-রাত্রে এবং তার পরের দিন বাড়ীতে কোনো উৎপাত হলো না...কোনো ঘটনা নয়। রাত্রে শুতে যাবার সময় বৌদিকে আমি বললুম—শুয়ে শুয়ে মনে মনে তুমি সেই ব্রাহ্মণকে ডেকো ...তাঁকে আসতে বলো। এ-কথা যেমন শেষ করেছি...সঙ্গে সঙ্গে বৌদির ঘরের খাটে তিনটে পাটকেল পড়লো—খাটে মশারি ফেলা...মশারি ফুঁড়ে পাটকেল পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে... সদর তখন বন্ধ...সদরে পড়লো তিনটি ঘা। বৌদি তখন বলে উঠলেন—না, না...এ-সব আর নয়...ভয় করে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ঘা পড়া বন্ধ...ঘরে পাটকেল পড়া বন্ধ।

সে-রাত্রে কোনো কিছু ঘটলো না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না...ভূত কি বিদায় নিয়ে গেল সত্য...না, আবার উৎপাত সুরু করবে ?

এ-চিঠির নীচে 'পুনশ্চ' আছে। ডাক্তার লিখেছেন—

চিঠিখানা লেখার পর আপনার চিঠি পেলুম। বাড়ীর সকলকে সে-চিঠি দেখালুম। তারপর বৌদি সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরে যাবেন...হঠাৎ তাঁর দু-কাণে কে বেশ জোর করে দু টুকরো তুলো গুঁজে দিলে...আতর-মাখানো তুলো। ঘরে আমাদের আতরের শিশি আছে...এ সেই শিশির আতর। বৌদি গ্রাহ্য না করে (কারো স্পর্শ তিনি অনুভব করেননি) রান্নাঘরে ঢুকলেন...অমনি তাঁর গায়ে কে একখানা র‍্যাপার ফেলে দিলে। এ-র‍্যাপার ছিল বৌদির ঘরের আনলায়। এ ছাড়া আরো রঙ-তামাসা চালিয়েছে ভূতটা। আমরা বসে কথা কইছি...ঘর থেকে একটা টাকা আর কটা পয়সা ঝুনঝুন করে

এসে পড়লো আমার সামনে…কে যেন সেগুলো ছুড়ে দিলে!

আপনার কথামত বৌদিকে বলেছি—কাগজ-পেন্সিল নিয়ে চুপ করে ঘরে বসে থাকতে। তিনি তাই বসেছিলেন—বসবার দশ-বারো মিনিট পরেই তাঁর হাত কাঁপতে লাগলো…কাগজে তিনি লিখতে সুরু করলেন…কটা ছত্র। সে-লেখা এ-চিঠির সঙ্গে আপনাকে পাঠালুম। কটি লাইন লেখার পরেই বৌদি অজ্ঞান হয়ে ঢুলে মাটিতে পড়ে গেলেন।

কাগজের সে-ছত্রে লেখা—এখন তোমাকে কোনো কথা বলবো না…তবে ভয় নেই তোমার। আমি তোমাকে ভালোবাসি। অনেক কাল তোমাকে না দেখে আমার মন বড় খারাপ…তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।. তুমি ব্যথা পেলে আমার কষ্টের সীমা থাকে না। তুমি জানো, তুমি সেণ্ট ব্যবহার করো…চিরদিন আমার তাই ইচ্ছা…কেন তুমি ব্যবহার করো না? আমি তোমার কাণে আতর-মাখা তুলো গুঁজে দিয়েছি…তোমাকে স্পর্শ করে বড় আনন্দ পেয়েছি। আমাকে ভুলো না…আমি তোমাকে কখনো ভুলবো না।

এর পর বৌদি…মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে বৌদি বেশ সহজ ভাবেই কথা কইলেন। তবে এখন হঠাৎ মাঝে মাঝে 'আমি এসেছি' এই কথা বলে তিনি অজ্ঞান হচ্ছেন।

এ সম্বন্ধে গবেষণা-আলোচনা করে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন—এ-প্রেতাত্মা ডাক্তারের বৌদির স্বামী। এবং ডাক্তারের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে যে-বিবরণ জেনেছিলেন…তা থেকে তাঁর অভিমত—বৌদি ভাগলপুরে থাকতেন না…অন্য জায়গায় থাকতেন…বিধবা হবার পর ডাক্তার তাঁকে নিজের

কাছে এনে রাখেন। স্বামীর প্রেতাত্মা সেখানে স্ত্রীকে দেখতেন...স্ত্রী ভাগলপুরে চলে আসবার পর প্রেতাত্মা স্ত্রীকে না দেখে এখানে আসেন এবং নিজের পরিচয় দেবার জন্য ঐসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন; শেষে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বৌদি বসবার পর থেকে স্ত্রীকে প্রেতাত্মা মনের কথা জানাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর পর থেকে বৌদি প্রায় অজ্ঞান হতেন। তাতে বোঝা যেতো, প্রেতাত্মার সঙ্গে তাঁর communion বা আলাপ চলেছে! এমন ঘটনা...সম্পাদক মন্তব্য করেছেন—বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে। এসব প্রেতাত্মা নিষ্ঠুর নয়...এরা অত্যাচার করতে চায় না—সম্পর্ক-গুণে এরা মমত্বশীল!

পাঁচ

হানাবাড়ী

১৯০৯ সালের ঘটনা। কলকাতার গায়ে কাঁকুড়গাছি... সেখানকার ঘটনা।

এ-ঘটনার কথা হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনার বিবরণ:—

অমৃতলাল দাস...২৯ নম্বর কাঁকুড়গাছি লেনে তিনি বাস করেন।

১৯০৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে তিনি লিখেছেন—

১। হানাবাড়ীর ইতিহাস:

তিনি লিখেছেন—এ-বাড়ীতে তিনি আসবার আগে এটা ছিল পোড়ো বাড়ী...সৌখীন ধনীর বাগান-বাড়ী...বাবু তাঁর ইয়ারবক্সীদের নিয়ে মাঝে মাঝে এসে হৈ-হল্লা করতেন...

গণিকা আসতো···মদমাংস···অর্থাৎ বিলাসিতার পূর্ণ জোয়ার চলতো···বহু মাতাল-বদমায়েশ প্রতিপালিত হতো।

তার পর অবস্থা-বৈগুণ্যে বাগান-বাড়ী পোড়ো হয়ে উঠলো···তার আগে বহু লোক নাকি এ-বাড়ীতে আত্মহত্যা করেছে···বহু লোক খুন হয়েছিল বদমায়েশ গুণ্ডাদের হাতে। বাড়ী খালি পড়ে থাকার সময় রটনা হলো—বাড়ীতে ভূত-প্রেত আছে। দিনেও বাগানে মানুষ ঢুকতো না···রাত্রে বাগান-বাড়ীর সামনে দিয়ে চলাফেরা করতে মানুষজন ভয় পেতো; তাছাড়া তখন ও-মহল্লায় বসতি ছিল অল্প।

বহুকাল বাড়ী-বাগান পড়ে থাকবার পর একজন ব্রাহ্মণ এসে বাগানে থাকেন খুব অল্প ভাড়ায়। প্রথমে এ-বাড়ীতে আসতে তাঁর মনে দ্বিধা জেগেছিল···কিন্তু কি করেন···আয় অল্প···বেশী ভাড়া দেবার সামর্থ্য নেই···তার উপর ভূত-প্রেত আবার কী! এমনি পাঁচ কথা ভেবে তিনি সপরিবারে এ-বাড়ীতে বাস করতে আসেন।

এ-বাড়ীতে বাস করতে আসার পর ছ মাসও পার হলো না···তাঁর একটি মেয়ে হঠাৎ বিনা-রোগে মারা গেল। তখন ব্রাহ্মণ ভয়ে এ-বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর বহু বছর আবার বাড়ীখানা খালি পড়ে রইলো···কোনো ভাড়াটে বিনা ভাড়াতেও বাস করতে আসে না।

তারপর ১৮৯৪-৯৫ সালে সকলের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে অমৃতলাল দাস এলেন এখানে সপরিবারে বাস করতে। পাড়া-পড়শী যারা ছিল··তারা মুখ গম্ভীর করে নিষেধ করলে···বললে—প্রাণে প্রাণে এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যান, মশাই। কিন্তু অমৃতলাল হেসে জবাব দিলেন—অদৃষ্ট নিয়ে মানুষের

বাস···ভূতে কি করবে! তিনি বললেন—ভূত শুধু মানুষের মনে আতঙ্ক···তাছাড়া তার অস্তিত্ব নেই।

এর পর দু বছর ভদ্রলোক বেশ নিরুপদ্রবে বাস করলেন। দু বছর পরে একদিন হঠাৎ দুপুর বেলায় বাড়ীর উঠানে ইট-পাটকেল পড়তে লাগলো···কারো গায়ে লাগে না···শুধু ঝর-ঝর করে পাটকেল পড়ে—তাও শুধু দুপুর বেলায়। এ ছাড়া আর কোনো উপসর্গ নয়! উপরি-উপরি ক মাস সমানে দুপুর বেলায় ইট-পাটকেল পড়তে লাগলো। বাড়ীর সকলে ভাবলেন, বদমায়েশদের কাজ। এঁরা বাগান-বাড়ী দখল করে আছেন···তারা ঢুকতে পাচ্ছে না···নিজেদের বদমায়েশী করবার জায়গা পাচ্ছে না···তাই তারা চায়, ভয় দেখিয়ে এখান থেকে ওঁদের তাড়াতে। তাছাড়া বাগানে ভালো ভালো ফলের গাছ অসংখ্য···পুকুরে মাছ অজস্র··· তারা না পায় ফল নিতে···না পারে মাছ নিতে। ইট-পাটকেল পড়া এঁরা গ্রাহ্য করলেন না।

একদিন দুপুরে ইট পাটকেল পড়ছে···এঁরা বেরুলেন সন্ধানে···কোথা থেকে পড়ে! বাগানের বাইরে থেকে পড়ছে···তবে বেশী দূর থেকে নয়! বেশ ইট-পাটকেল পড়ছে ··এঁরা যেমন সেদিকে গেছেন, অমনি ইট-পড়া বন্ধ হলো।

পরের দিন আবার ঠিক সেই সময়ে তেমনি ইট-পাটকেল পড়া। এঁরা গিয়ে দেখেন, ওগুলো আসছে দক্ষিণ দিক থেকে—সেদিকে চালতা গাছ···আর চালতা গাছের পাশে পায়খানা। এঁরা সে-ধারে যাবামাত্র পাটকেল পড়া বন্ধ হলো।

পরের দিন···উত্তর দিকে রান্নাঘর···রান্নাঘরের গায়ে ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছ···সেদিক থেকে পাটকেল পড়তে লাগলো। এঁরা যাবামাত্র পড়া বন্ধ! তার পরের দিন বাড়ীর বাইরের দিক···পশ্চিম দিক থেকে পড়া—এঁরা যাবামাত্র সে-পড়া বন্ধ! পাটকেল পড়ার মজা এই যে, যেদিক থেকেই পড়ুক, সবগুলো এক সাইজের—পথে যে-খোয়া দেওয়া হয়, তেমনি পাটকেল। অথচ কাছাকাছি কোথাও পাটকেল জড়ো হয়ে আছে···তাও দেখা গেল না। সবগুলো কুড়িয়ে এঁরা বাগানে এক-জায়গায় সেগুলো জড়ো করে রাখলেন।

এর পর একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীর পুরুষরা কাজ-কারবার সেরে বাড়ী ফিরে মেয়েদের কাছে শুনচেন রোয়াকে বসে সেদিনকার তুপুরের বৃত্তান্ত—হঠাৎ রান্নাঘরের ছাদে ধপ করে পড়লো একখানা পাথরের টুকরো···ছাদে পড়ে সেটা গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো তাঁদের সামনে বাড়ীর উঠানে। রান্নাঘর খড়ে ছাওয়া।

তখনি সকলে লাঠি-সোঁটা নিয়ে বেরুলেন···সঙ্গে হ্যারিকেন লণ্ঠন। তন্নতন্ন করে সর্ব্বত্র খুঁজলেন—কোথায় কে? তাঁরা লণ্ঠন নিয়ে খুঁজছেন···সে-আলো দেখে পাড়ায় থাকে কার্ত্তিক···সে এলো···বললে—ব্যাপার কি? এঁরা বললেন ব্যাপার। কার্ত্তিক বললে—বলেন কি মশাই!

এ পর্য্যন্ত অমৃতবাবু পাড়ার কারো কাছে বাড়ীর এ-ঘটনার কথা ঘুণাক্ষরেও জানাননি। এ-কথা শুনে কার্ত্তিক বললে—তাই-তো···এ যে ভয়ানক আশ্চর্য! কার্ত্তিক বললে—আমরাও তক্কে থাকবো···এর ব্যবস্থা করা চাই।

ব্যবস্থা হোক না হোক···ইট-পাটকেল পড়া সমানে চলতে লাগলো···প্রত্যহ! বাড়ীর পুরুষমানুষরা···তাঁদের সঙ্গে পাড়ার কার্ত্তিক···সকলে রাত্রে রীতিমত পালা করে পাহারাদারী করেন···কিন্তু কোনো ফল হয় না।

শেষে একদিন বাড়ীর সকলে পরামর্শ করে বেলিয়াঘাটা থানায় গিয়ে নালিশ লেখালেন। থানা থেকে এলো পাহারাওয়ালা তদারক করতে। তার উপর ডেপুটি কমিশনার হুকুম দিলেন—দিনে-রাতে দুজন করে কনষ্টেবল পালা করে বাগান-বাড়ীর চৌকিদারী করবে। পুলিশের সামনেই ইট-পাটকেল পড়তে লাগলো···দুপুর বেলায়···দুবার তিনবার করে। রাত্রে ইট-পাটকেল পড়া বন্ধ হলো। দু-তিন দিন পরে থানা থেকে অফিসার এলেন তদারকীতে। এসে তিনি পাড়ার লোকজনকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন ···করে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে গেলেন—খবর্দার···কোনো উৎপাত যেন না হয়! হলে সকলকে ধরে কেস্ করে চালান দেবো কোর্টে।

এর পর কদিন ইট-পাটকেল পড়া বন্ধ। বাড়ীর সকলে নিশ্বাস ফেললেন···ভাবলেন, বদমায়েশদের কাজ···পুলিশ দেখে সকলে ঢিট হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত!

অমৃতবাবুর এক ভাইয়ের এক বন্ধুর ছিল বন্দুক ···সেই বন্ধুকে তিনি নিয়ে এলেন বন্দুক-সমেত···তাকে দিয়ে কটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়ে পাড়ায় জানিয়ে দেওয়া হলো— বন্দুক আছে···চালাকি করতে এসো না আর!

এর পর কদিন নিরুপদ্রব···কোনো হাঙ্গাম নেই!

এক বছর নিরুপদ্রবে কাটলো। তারপর আবার উৎপাত

সুরু। একদিন সকালে উঠে সকলে দেখেন, সদরের সামনে কে মানুষের ময়লা ফেলে গেছে এক ঝোড়া। ম্যাথর ডাকিয়ে সাফ করানো হলো। তারপর স্নান করবার পর সকলে দেখেন···বেলা তখন সাড়ে নটা···ভিতরের রোয়াকে কাগজে জড়ানো মানুষের ময়লা। কার কর্ম্ম···কে করলে এ-কাজ? হৈ-হৈ চীৎকার চললো···কিন্তু নিষ্ফল চীৎকার। সকলে ভাবলেন, যারা ইঁট-পাটকেল ছুড়তো···তাদের এ-এক নূতন পর্ব সুরু হলো!

সেদিন থেকে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় মানুষের ময়লা পড়তে লাগলো বাড়ীর উঠানে রোয়াকে—সজাগ থেকে হুঁশিয়ার থেকে সন্ধান করে কোনো ফল হলো না!

দিনের পর দিন এই এক উপদ্রব চলতে লাগলো সমানে। এ-খবর পুলিশকে বা পাড়ার কাকেও জানালেন না—তাদের কী বলবেন?

প্রত্যহ এ-উৎপাত। তবে মজা এই, ন্যাকড়ার পুঁটলি করে···কাগজের ঠোঙায় করে ময়লা পড়ছে বটে···কিন্তু কারো গায়ে পড়ছে না বা ন্যাকড়া কি বগলি ছিঁড়ে এতটুকু মেঝেয় বা মাটিতে পড়ছে না। নিরুপায়ে সকলে দিন কাটান···কোনো উপায় পাওয়া যায় না এবং প্রায় মাসখানেক এ-উপদ্রব চলার পর হঠাৎ এটা হলো বন্ধ।

এ-ব্যাপার বন্ধ হলো বটে···কিন্তু নতুন উপসর্গ সুরু হলো। অর্থাৎ জিনিষপত্র হারাতে লাগলো এবং এখানকার জিনিষ ওখানে···সেখানকার জিনিষ এখানে—এই উৎপাত! তরী-তরকারী খাবারদাবার·· এই এখানে আছে···পরের মুহূর্ত্তে দেখা গেল, নেই! কাপড়-জামা···টাকাকড়ি···এমন কি

গহনাগাটি পর্য্যন্ত হারাতে লাগলো—বাক্স-প্যাটরা থেকে হারাতে লাগলো।

খাবারদাবার তরী-তরকারী চাবি দিয়ে আলমারিতে রাখার ব্যবস্থা হলো···তা সত্ত্বেও আলমারি থেকে তা সরে যায়! আলমারিতে চাবি দেওয়া···অথচ তার ভিতর থেকে জিনিষ গেছে সরে! সেল্ফ্ থেকে নুন-তেল পর্য্যন্ত সরে যায়! বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সকলে কাজকর্ম্ম ভুলে সর্ব্বক্ষণ পাহারাদারী করছে···তার মধ্য থেকেও জিনিষ সরে যায়!

একদিন সকালে গা থেকে র‍্যাপার খুলে বাড়ীর একজন পুরুষ সেটা উঠানের দড়িতে রাখলেন—রোদে থাকুক··· তিনি যাবেন স্নান করতে। যেমন রাখা···সঙ্গে সঙ্গে দড়ি-থেকে র‍্যাপার সরে অদৃশ্য! সকলে অবাক! বাড়ীতে ভিখিরী ঢোকেনি···কোনো মানুষ আসেনি যে সন্দেহ হবে, সে নিয়ে গেছে!

এমনি করে শেষে যখন দু-একখানা গহনা যেতে লাগলো, তখন সকলে রীতিমত চঞ্চল হলেন। তাইতো···এভাবে বাস করা যাবে কি করে?

চার-চার বছর সমানে এমনি নিগ্রহ ভোগ···তবু সকলে মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। চার বছর পরে অমৃতবাবুর বাবা মারা গেলেন। দুটি ভাইকে বিদেশে যেতে হলো কাজের জন্য—একজনকে যেতে হলো শিলঙ··আর একজনকে বোম্বাই। পরিবারে মানুষের সংখ্যা কমলো। সকলে কাঁটা হয়ে আছেন!

অমৃতবাবুর বাবা মারা যাবার তিন-চার দিন পরে···সকলের অশৌচ···রাত্রে সকলে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন···অমৃতবাবুর মার

ঘুম ভেঙ্গে গেল ঝুনঝুন ঝনঝন শব্দে। তিনি সকলকে ডেকে তুললেন। তাঁর ঘরে আলো নেই। মা ঘরে। এঁরা আলো নিয়ে গিয়ে দেখেন, ঘরের মেঝেয় কখানা বাসন ছড়ানো রয়েছে···আর ঘরের কোণে একটা টেবিলের উপরে থলিতে ছিল খই···সেই খইয়ের থলি টেবিলে নেই—সেটা কে নামিয়ে এনে ঘরের মাঝ মধ্যখানে রেখেছে।

আরো দেখা গেল, জানলার কপাটে ছিল লোহার খিল···সে-খিলটা খুলে কে মেঝেয় এনে ফেলেছে। ঘরের দরজায় খিল বন্ধ করে মা শুয়েছিলেন···জানলা ছিল লোহার খিলে বন্ধ···মা ঘরের দরজা খুলেছিলেন··জানলার দিকে চাননি···জানলা খোলেননি···অথচ এখন দেখা গেল, জানলার কপাট ভেজানো·· শুধু লোহার খিলটা উপড়ে খুলে মেঝেয় রাখা!

তখনো বাড়ীর লোক ভৌতিক ব্যাপার বলে আস্থা করছেন না···তবে বিস্ময়ের আর কারো সীমা-পরিসীমা নেই!

এর পর আর এক রাত্রে···ঐ অশৌচ-অবস্থাতেই রাত্রে সকলে ঘুমোচ্ছেন···এক ঘরে সকলে শুয়েছেন···হঠাৎ সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল···ঘরের মধ্যে ভারী জিনিষ পড়ার শব্দে। ঘরে আলো ছিল না···ঘুম ভেঙ্গে সকলেই মৃদু কণ্ঠে বলাবলি করছেন—কি যেন পড়লো···শব্দ শুনেছো! উঠে আলো জেলে সকলে দেখেন, মেঝেয় বড় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার পড়ে আছে। এটা ছিল অন্য ঘরের সেল্‌ফে—এ-ঘরের দরজা খিল দিয়ে বন্ধ করা···ও ঘরের দরজাও তালা আঁটা—কে আনলো?

সকলে উঠে তখনি সন্ধান করা…দেখেন, এ-ঘরের দরজায় খিল। বেরিয়ে গিয়ে দেখেন, ও-ঘরের দরজা তালাবন্ধ। এ-কাজ বেড়াল বা ইঁদুরের নয়…বা ছুঁচোরও নয়…মানুষ ছাড়া এ-জিনিষ আনবে কে?

কে—সে? এ-প্রশ্নের মীমাংসা কেউ করতে পারলেন না!

নিষ্ফল সন্ধান শেষ করে সকলে ঘরে ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘটনা। ছোট ভাইয়ের বিছানার পাশে একটা টেবিলে জ্বলছিল বাতি…ছোট দেখলেন, সেটা কে বেশ সবেগে মেঝেয় ছুড়লো! কারো হাত নেই…মানুষ নেই…অথচ বাতি যেভাবে মেঝেয় পড়লো…কেউ জোরে ছুড়ে ফেলা ছাড়া বাতি সেভাবে পড়তে পারে না!

আবার উঠে তল্লাস…তল্লাস হলো সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

তার পর ভাইয়েরা যে যার বিছানায় শুতে যাবে…আর এক ভাই দেখলেন, কম্বলে কি একটা ভারী জিনিষ…কম্বল ফেলে দেখেন, বড় একখানা কাটারি! এ-কাটারি থাকে ভাঁড়ার-ঘরে…কে আনলো সেখান থেকে?

যতকাল অশৌচ ছিল…ততদিন শুধু এমনি জিনিষপত্র হারানো…তাছাড়া আর কোনো উপসর্গ নয়!

বাপের শ্রাদ্ধ চুকলে ছ মাস সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব। তার পর যা ঘটতে লাগলো…তা আরো অপূর্ব্ব, আরো বিচিত্র। এতদিনকার এসব ব্যাপারে বাড়ীর সকলের মনের অনেক অদল-বদল হয়ে গিয়েছে…ভূতে এখন সকলের হয়েছে বিশ্বাস —এতকাল যা যা ঘটেছে… তার মূলে সঙ্গত কোনো কারণ আছে…সে কারণ এঁরা বুঝতে পারছেন না—এমনি ছিল

সকলের ধারণা…বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সকলের। কিন্তু এখন এমন সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে লাগলো…যার ব্যাখ্যা মেলে না! কাজেই ভৌতিকে বিশ্বাস হয়েছে।

বাঙলা ১৩১১ সালের ১০ই আষাঢ় তারিখ—রাত তখন প্রায় দেড়টা…ঘরে দরজা বন্ধ…বড় ভাই ঘুমোচ্ছেন…হঠাৎ তাঁর ঘুম গেল ভেঙ্গে। মনে হলো, ঘরে কে চলে বেড়াচ্ছে… পায়ের খসখস শব্দ তিনি স্পষ্ট শুনলেন। চেঁচিয়ে তিনি সকলকে ডাকতে লাগলেন…বললেন—আলো নিয়ে এসো।

এ-কথা বলে তিনি ঘরের দরজা দিলেন খুলে। এঁরা ঢুকলেন ঘরে ‥হাতে লণ্ঠন…ঘরে ঢুকে কিছু দেখলেন না… কানে শুনলেন, ঘরের মেঝেয় টাকা বা আধুলি গড়াবার শব্দ! সে-শব্দ থামে না…আধুলি বা টাকা গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই! আলোয় দেখে সেটা একজন কুড়িয়ে নিলেন…কুড়িয়ে নিয়ে দেখেন, টাকা নয়, আধুলি নয়…একখানা সোনার গিনি (তার দাম তখন পনেরো টাকা)। এটা কুড়োবার পরেও তেমনি টাকা গড়ানোর শব্দ ‥আর একখানা গিনি পাওয়া গেল। সকলে অবাক। দু-দুখানা গিনি এলো কোথা থেকে? কে নিয়ে এলো?

কজনে চলেছে জল্পনা…তখন মা বললেন—তাঁর হাতবাক্সে আছে বটে দুখানা গিনি আর তার সঙ্গে কটা আধুলি, সিকি। এ দুখানি গিনি বোধ হয় তাঁর হাতবাক্সে রাখা সেই গিনি! তখনি তিনি তাঁর হাতবাক্স খুললেন। খুলে দেখেন, গিনি দুখানা তো নেইই…সেই সঙ্গে আধুলি-সিকিও নেই! সকলে অবাক! মা বললেন—ছাখো, যদি ওঁর কৃপা হয়…সেগুলো যদি ফিরিয়ে ছান!

পরের দিন শনিবার...বড় ভাই অফিস থেকে ফিরে জামা খুলে আলনায় রাখছেন...তাঁর চোখ পড়লো খাটের বিছানায়। দেখেন, একটা টাটকা তৈরী দানাদার! খবর নিয়ে জানলেন, বাড়ীতে ও-খাবার আনা হয়নি।

সকলে বললেন—ভূতে দিয়ে গেছে! ভূতের দানাদার... খেতে ভয় করে...শেষে অসুখ হবে! ফেলতেও ভয় করে ...যদি তার জন্য উৎপাত পীড়ন করে। খানিকক্ষণ তর্ক চললো...তার পর বড় ভাই বললেন—খাওয়া যাক। আদর করে দিয়েছে...আমিই খাই...তোমরা খেয়ো না।

বড় ভাই খেলেন দানাদার...ভালো জিনিষ!

পরের দিন রবিবার...অন্য এক ভাইয়ের ঘরের সেলফে দেখা গেল, একটি কিষণভোগ আম...সুপক্ক ফল! বাড়ীতে এ আম কেনা হয়নি...বা কেউ দেয়নি। ভূতের দান... স্নেহের দান...সেটি খাওয়া হলো। সব ভাই মিলে খেলেন। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা আর এক ব্যাপার। তখনো অন্ধকার নামেনি...অন্য ভাইয়েরা রোয়াকে...বড় ভাই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে যাবার উদ্যোগ করছেন...হঠাৎ তাঁর ঘরের মেঝেয় ছাদের দিক থেকে পড়লো কি একটা জিনিষ...শব্দ হলো ঠুনন্! আলো জেলে তিনি দেখেন, একটা সিকি। তিনি সেটি নিলেন কুড়িয়ে...যেমন কুড়িয়ে নেওয়া... সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিধারার মতো ছাদ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো আধুলি, সিকি আর দুয়ানি। ভাই ভাবলেন, যেগুলো মায়ের বাক্স থেকে সরিয়েছিল...সেগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছে নিশ্চয়! দেখা গেল, তাই বটে! মায়ের বাক্স থেকে যতগুলি গিয়েছিল, ঠিক ততগুলিই পাওয়া গেছে!

তার পরের দিন সোমবার···আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! বড় ভাই আজ সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে ফিরে জামা খুলে আনলায় রাখবেন···দেখেন, ঘরের মাঝখানে মেঝেয় কে রাখলো একপীশ চন্দনকাঠ, চন্দনপীড়ি আর তামার কখানা পাত্র···অর্থাৎ কোশাকুশি, পঞ্চপাত্র···ঘরের কোণে একঘড়া গঙ্গাজল পর্য্যন্ত!

দেখে মনে হলো, কে যেন সদ্য পূজা বা সন্ধ্যাহ্নিক সেরে উঠে গিয়েছে।

বাড়ীশুদ্ধ লোক অবাক! এসব জিনিষ বাড়ীরই···কিন্তু ঠাকুর-ঘরেই থাকে···সে-ঘর থেকে কখনো নাড়া হয় না··· এসব কে নিয়ে আসবে এ শোবার ঘরে!

এ-ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর সকলে দাঁড়িয়ে কল্পনা-জল্পনা করছেন···উপর থেকে ঠুঙ্ করে একটা টাকা পড়লো বড় ভাইয়ের সামনে। মা বললেন—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রে···তাঁর উদ্দেশে সকলে প্রণাম করি আয়।

সকলে অলক্ষ্য আত্মার উদ্দেশে প্রণতি জানালেন। প্রণতি জানাবার পর বড় ভাইয়ের সামনে পড়লো একটি দুয়ানি···আর অমৃতবাবুর সামনে পড়লো একটি সিকি!

এ-ব্যাপারের পর থেকে বাড়ীতে উৎপাত উপদ্রব আর হয়নি···কি কারণে জানি না, যে-প্রেতাত্মার বাস এ-বাড়ীতে ···তার মনে হয়তো দরদ-মমতা হয়েছিল···সেই জন্যই এ-বাড়ীর মঙ্গলই করতো।

পূর্ব্বে বলেছি, প্রেতাত্মা অনেক সময় বহু উপকার করেন। আমার বাল্যকালে আমাদের গৃহে যে-ঘটনা হয়েছিল

…পূর্ব্বে বলেছি। সে-কথার সঙ্গে মনে পড়ছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী। তাঁর মুখেই এ-কাহিনী শুনেছি।

অবনীন্দ্রনাথ তখন ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ীতে (জোড়াসাঁকোয়) থাকেন। একবার তিনি কলিকের ব্যথায় অত্যন্ত কষ্ট পান…বাড়ীতে বড় বড় ডাক্তারদের ভিড় জমে। তখন এত ইনজেকসনের বা শালফা-প্রভৃত ঔষধের নামগন্ধ ছিল না! ডাক্তাররা নানা ঔষধে ফল পেলেন না… তখন তুটি মর্ফিয়া ইনজেক্ট করেন। তাতেও ফল পাওয়া গেল না। যাতনায় অবনীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কাতর! ডাক্তাররা হতাশ হয়ে চলে গেলেন…বলে গেলেন—তু-তুটি মর্ফিয়া ইনজেকসন…বনের বাঘকে দিলে তারা শান্ত হয়…তাতেও ফল হলো না…নিরুপায়! অর্থাৎ একরকম জবাব দিয়ে যাওয়া!

তারপর এলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয়। হোমিওপ্যাথিতে তাঁর তখন অত্যন্ত খ্যাতি এবং অসাধারণ তাঁর পশার। তিনি এসে দেখলেন…সব শুনলেন …দেখে শুনে তিনি শুধু একটি কথা বললেন। অবনীন্দ্রনাথকে বললেন—বড় বেশী নার্ভ খাটিয়েছেন…কাজেই এমন অবস্থা।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—নার্ভ খাটালুম কবে?

ডাক্তার বললেন—এত লেখা…ছবি আঁকা…মাথায় কত কল্পনা, কত চিন্তা…সব নার্ভ-এনার্জি ব্যয় হয়ে গিয়েছে!

রাত্রি হলো‥ যাতনা বাড়লো…অসহ্য কাতরানি। শেষে অনেক রাত্রে কেমন ঝিমুনি এলো।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—রোগের যাতনায় এপাশ করছি, ওপাশ করছি···আর মুখে কেবল ডাকছি নিজের পরলোকগতা মাকে—মাগো···জননী গো···আর যে সহ্য করতে পারি না, মা!

ঝিমুনো ভাব চলেছে···হঠাৎ মনে হলো, কে ডাকছেন আমার নাম ধরে! কণ্ঠ শুনে মার কথা মনে পড়লো ···বিশ্বাস করবে না, চোখে স্পষ্ট দেখলুম আমার মাকে! সেই স্নেহভরা বরাভয় মূর্ত্তি! মনে ছিল না, মা এ-পৃথিবীতে নেই! বললুম—বড় যাতনা মা···যাতনায় মরে যাচ্ছি।

মা বললেন—কোথায় যাতনা?

দেখিয়ে দিলুম পেটের সে-জায়গা···মা বললেন—আমি হাত বুলিয়ে দিই···সেরে যাবে।

মা হাত বুলোতে লাগলেন···তার মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি···বুঝিনি। যখন ঘুম ভাঙলো···আরাম বোধ হলো··· যাতনা নেই মোটে! চেয়ে দেখি, ভোরের আলো ফোটো-ফোটো। ভয়ানক খিদে বোধ হলো। বেয়ারাকে ডাকলুম··· সাড়া মিললো না। উঠে গিয়ে তাকে বারান্দায় দেখলুম···ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে বললুম—রুটি-মাখন আন্· ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—সে তো অবাক! ভেবেছিল, বাবু বুঝি সরলেন···কখন ঘাটে যেতে হবে···ঘুমিয়ে নি! তা কোথায় কি···বাবু বলেন খিদে! তখনি খাবার এলো। খেয়ে মনে হলো, যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছি!

বেয়ারা তখনি বাড়ীর মেয়েদের ডাকলো···সকলে

ধড়মড়িয়ে উঠলেন। আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; আমাকে সুস্থ দেখে ভারী খুশী!

এ-কাহিনী শেষ করে তিনি বলেছিলেন—বিজ্ঞান-বিজ্ঞান করে চীৎকার করি…ভাবি, এসব বুজরুকি! কিন্তু তা নয় …আছে, আছে…ইহলোক পরলোক…এবং মানুষ পরলোকে গেলেও তাঁদের স্নেহমায়া নিঃশেষ হয় না! ডাকার মতো ডাকতে পারলে আমরা তাঁদের পাই—আমি এ-কথা মানি…খুব মানি।

ছয়

ভূতের মায়া-মমতা : দ্বেষ-হিংসা

'আয়ুর্ব্বেদার্থচন্দ্রিকা'—আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে চমৎকার একখানি অভিধান। এ-অভিধানখানি সঙ্কলন করে গিয়েছেন এক গ্রামের বিচক্ষণ কবিরাজ শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত। তিনি একটি রোগীর সম্বন্ধে অপূর্ব্ব কাহিনী লিখেছেন তাঁর সে-গ্রন্থে… কাহিনীটি বলি।

এক গ্রামে তিনি রোগী দেখতে গিয়েছিলেন—রোগী চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ছেলে…রোগ রক্ত-আমাশয়। চার-পাঁচদিন তিনি রোগী দেখতে যান…ছেলেটির চিকিৎসা করেন…রোগ কিন্তু সারে না। তারপর একদিন-অন্তর তিনি যান রোগী দেখতে…এ-ওষুধ ও-ওষুধের ব্যবস্থা করেন… কিন্তু কোনো ওষুধে ফল হয় না। অনেক দিন ভুগে ছেলেটি শেষে মারা গেল।

ছেলেটি মারা যাবার আট-দশদিন পরে ঐ বাড়ীরই পাঁচ বছরের একটি মেয়ের হলো রক্ত-আমাশয় রোগ।

কবিরাজ মশায়ের ডাক পড়লো। তিনি চার-পাঁচদিন দেখতে গেলেন···নানা ঔষধ দিলেন···কিন্তু কোনো ঔষধে ফল হয় না। নিত্য একটা-না-একটা উপসর্গ···বালিকার যাতনা··· শেষে একদিন কবিরাজ মশায় গিয়ে রোগী দেখে হতাশ হলেন—বাড়াবাড়ি অবস্থা। কবিরাজ মশায় রীতিমত চিন্তিত হলেন; ভাবলেন, সম্ভ কদিন আগে বাড়ীর একটি ছেলে তাঁর হাতেই এই রোগে মারা গিয়েছে···এখন আবার মেয়েটির সেই কাল-রোগ এবং তার এমন অবস্থা। তিনি শেষে তাঁদের স্পষ্ট বললেন—আমার দ্বারা কিছু হলো না···আপনারা অন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। তাঁরা তাতে রাজী হলেন না···বললেন—আপনার হাতে ওর জীবন-মরণ আর আমাদের অদৃষ্ট!

কবিরাজ মশায়কে তাঁরা ছাড়লেন না···সেইখানেই তাঁকে স্নানাহার করতে হলো। আহারাদির পর বৈঠকখানা ঘরে কবিরাজ মশায় বিশ্রাম করছেন···গ্রীষ্মের দুপুর··· ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ—বৈকালে দূর গ্রামে দু-তিনটি রোগী দেখতে যাবার কথা···তিনি ভাবছেন, কি করে কি হবে! এমন সময় তাঁর সহিস এসে খবর দিলে (কবিরাজ মশায়ের নিজের গাড়ী ঘোড়া ছিল)···সহিস খেতে গিয়েছিল ···গাড়ীর ঘোড়া ছিল দড়িতে বাঁধা···সহিস খেয়ে এসে দেখে, দড়ি ছিঁড়ে ঘোড়া পালিয়েছে···তার সন্ধান মিলছে না।

খবর শুনে কবিরাজ মশায়ের চক্ষুস্থির! তিনি বললেন সহিসকে—ছাখ ছাখ···কোথায় পালাবে···হয়তো বাড়ীর পথে গিয়েছে।

সহিস গেল ঘোড়ার সন্ধানে। কবিরাজ মশায় স্থির থাকতে পারলেন না…তিনিও অন্য পথে চললেন ঘোড়া খুঁজতে।

খুঁজতে বেরিয়ে গ্রাম ছেড়ে মাঠ…সেই মাঠ ধরে তিনি চলেছেন। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলেন… দেখেন, ওদিক থেকে ঘোড়াটা আসছে এদিকে…আসছে নিজের ইচ্ছায় নয়…কে যেন তাকে ওদিক থেকে তাড়া দিয়ে নিয়ে আসছে! কে তাড়া দিচ্ছে…দেখতে পেলেন না। ঘোড়া এদিকে খানিকটা পথ আসে…তার পর আবার থেমে ঘুরে ওদিকে যেতে চায়·· পারে না যেতে…ওদিকে কে যেন তাকে যেতে দেবে না…তাড়া দিয়ে এদিকে চালাচ্ছে!

কবিরাজ মশায় অবাক! তিনি চললেন ঐদিকে এগিয়ে… এগিয়ে গিয়ে তিনি ঘোড়াকে ধরলেন…যেমন ধরা, অমনি শুনলেন স্পষ্ট কণ্ঠ…কণ্ঠ বালকের…তাঁকে উদ্দেশ করে বললে—আপনার ঘোড়া পালিয়েছিল…আপনি বুঝি ঘোড়ার খোঁজে বেরিয়েছেন?

কবিরাজ মশায় স্তম্ভিত! কে কথা কয়? মানুষ দেখা যায় না…অথচ কথা কইছে তাঁর কাছ থেকে দু-তিন হাত মাত্র দূর থেকে! তাঁর মুখে রা সরে না। কণ্ঠ আবার বললে—আমি বিপিন! ঐ যে ও-বাড়ীর ছেলে…রক্ত আমাশয় হয়েছিল…আপনি আমাকে দেখেছিলেন…সারাতে পারেননি। আপনারা জানেন, আমি মরে গিয়েছি…কিন্তু আমি মরিনি…এখানেই আছি। আপনি ভয় পাবেন না… আমার বোন শৈল খুব ভুগছে…ঐ এক রোগ…সারাতে পারছেন না…সেজন্য ভাবনা হয়েছে…তা ভাববেন না। আমি ওষুধ দিচ্ছি…হাত পাতুন।

এই পর্য্যন্ত বলে কণ্ঠ নীরব হলো। কবিরাজ মশায় যন্ত্র-চালিতের মতো হাত পাতলেন…তাঁর হাতে পড়লো তাজা কটা পাতা…কোন্ গাছের পাতা চেনেন না! সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ হলো সরব…কণ্ঠে ফুটলো কথা—এই পাতা ছেঁচে তার রস ছাগলের দুধে মিশিয়ে শৈলকে দুবার খেতে দেবেন… তাহলেই ও সেরে উঠবে।

এই পর্য্যন্ত…কোথায় কে, চিহ্ন নেই! কবিরাজ মশায়ের দেহে রোমাঞ্চ! কণ্ঠ মিথ্যা হলেও, স্বপ্ন হলেও গাছের পাতা তো স্বপ্ন নয়, মিথ্যা নয়—পাতা তাঁর হাতে! তিনি ঘোড়া নিয়ে ফিরলেন। ফিরেই ছাগল-দুধ চেয়ে নিয়ে …ঐ পাতা ছেঁচে রস করে…সে-দুধে মিশিয়ে অর্দ্ধেকটা তখনি দিলেন রোগীকে খেতে আর বাকি অর্দ্ধেক দিলেন দু-তিন ঘণ্টা পরে খেতে—রোগী কতক আরাম পেয়ে ঘুমোলো। কবিরাজ মশায় গাড়ী জুতিয়ে রোগী দেখতে বেরুলেন। সেখান থেকে তিনি আবার এ-বাড়ীতে ফিরলেন রাত আটটা-নটা নাগাদ। এসে দেখলেন, শৈল ঘুমোচ্ছে। শুনলেন, কোনো উপসর্গ নেই…রোগী সেই থেকে আরামে ঘুমোচ্ছে। শৈল সেরে উঠলো।

পরে কবিরাজ মশায় এ-ঔষধ পাবার কাহিনী বিপিনের পিতাকে বলেছিলেন। শুনে তিনি, তাঁর স্ত্রী চঞ্চল হলেন… বললেন—আমরা তার কথা শুনতে পাই না?

কবিরাজ মশায়ের কি মনে হলো…তিনি বললেন—একমনে তার চিন্তা করুন…একমনে তাকে ডাকুন…আমার বিশ্বাস, সে নিশ্চয় সাড়া দেবে।

মা-বাপ তখন একাগ্রমনে বিপিনের কথা চিন্তা করতে

করতে মনে মনে তাকে ডাকতে লাগলেন। এবং কবিরাজ মশায়ের সামনেই কথা ফুটলো—মানুষ নেই···ছায়া নেই ···শুধু কণ্ঠস্বর! সাড়া মিললো—বাবা, মা, আমি এসেছি।

কবিরাজ মশায় প্রশ্ন করলেন—কেমন আছো?

জবাব: ভালো। তবে এ-জায়গা ছেড়ে নড়তে পারছি না···কেবলি এখানে ঘুরছি বাতাসে মিশে। সকলকে দেখছি···সকলের কথা শুনছি···কিন্তু কাকেও কিছু বলতে পারছিলুম না। এখন শৈল সেরেছে···এবারে যেতেই হবে আমাকে।

তার পর আরো কথা হয়েছিল···কিন্তু সে-সব কথা এখানে বলার প্রয়োজন নেই।

এবারে বলি একটি বিদেশী কাহিনী। এ-কাহিনীটি ছাপা হয়েছিল বিলাতী কাশেল্‌স্‌ ম্যাগাজিনে।

কাহিনীটি লিখেছেন বিদুষী মিস স্কীন। তিনি লিখেছেন: দরিদ্র পরিবার···নিতান্ত দায়ে পড়ে স্বামীকে রোজগারের জন্য বিদেশে যেতে হলো। বিদায়ক্ষণে তরুণী পত্নী অশ্রুসজল নয়নে স্বামীর হাত ধরে বললেন—হপ্তায় দুখানা করে চিঠি লিখো···নাহলে দুশ্চিন্তায় আমি বাঁচতে পারবো না। স্বামী বললেন—নিশ্চয় লিখবো! এখানে তুমি রইলে, পাঁচ বছরের মেয়েটা রইলো···তুমি ভাবো, বড় সুখে আমি বিদেশে যাচ্ছি! উপায় নেই —অভাবের তাড়না! নিশ্চয় চিঠি লিখবো···প্রায় লিখবো··· তুমিও লিখবে হপ্তায় দুখানা করে চিঠি!

তারপর বিদায়। স্বামী গেলেন চলে…বাড়ীতে রইলেন তাঁর স্ত্রী আর পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে।

স্বামী চলে গেলেন বটে ··কিন্তু তাঁর চিঠি এলো না। দশ-বারো দিন গেল কেটে…তবু এক ছত্র চিঠি নেই স্বামীর! বেচারী স্ত্রীর চোখে জল, বুকে দুশ্চিন্তার পাহাড়…দিন তাঁর কাটে না। শেষে একদিন বিনা-মেঘে বজ্রপাত! খবর এলো, স্বামী বিদেশে মারা গিয়েছেন। সেখানে পৌঁছেই তাঁর হয় কঠিন রোগ…চাকরিতে জয়েন করা হয়নি· ·পৌঁছেই হাসপাতাল এবং হাসপাতালেই কদিন রোগ ভোগ করে মৃত্যু!

মেয়েকে নিয়ে বিধবা তরুণীকে আশ্রয় নিতে হলো অন্য গ্রামে এক আত্মীয়ের গৃহে।

যেদিন সেখানে গেলেন…সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়েছেন মেয়েকে বুকে নিয়ে…মেয়ে ঘুমোচ্ছে…তাঁর চোখে ঘুম নেই…ভাবছেন। অশেষ ভাবনা! হঠাৎ মেয়ে ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো…ডাকলো—বাবা…

মা চমকে উঠলেন…মেয়েকে বুকে টেনে বললেন—শোও ম'…ঘুমোও।

মেয়ে বললে—ঐ যে বাবা…ঐ! বাবা এসেছে, মা!

মা বললেন—কি বলছো, মা? তিনি কি করে আসবেন? তিনি এখন স্বর্গে।

—না, না ··ঐ যে বাবা, ঐ। মেয়ে তুললো তীব্র প্রতিবাদ। তার পর মা'য়ের দিকে না চেয়ে মেয়ে বলতে লাগলো—কেন তুমি চিঠি লেখোনি, বাবা? কেন তুমি এতদিন আসোনি…আমাকে ডাকোনি, আদর করোনি, চুমু খাওনি?

মা কাঠ! তিনি মেয়েকে বুকে চেপে ধরে তার মাথায় পিঠে হাত চাপড়াচ্ছেন। তার পর মেয়ে চীৎকার করে উঠলো —বাবা···বাবা···বাবা, না, তুমি যেয়ো না···যেয়ো না।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো মার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে—লুটিয়ে পড়ে কি তার কান্না!

অনেক কষ্টে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে মা শুলেন পাশে এবং ভাবতে ভাবতে তিনি হলেন নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে মেয়ে বললে তার মাকে—কাল রাত্রে বাবা এসেছিল, মা। বাবা আমার গায়ে মুখে হাত বুলোলো·· চুমু খেলে···কিছু বললে না। বাবার চোখে জল···বাবা চলে গেল।

শুধু এই একটি রাত্রি নয়—এর পর ক' দিন মাঝ-রাত্রে মেয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং মেয়ে উঠে বসে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকে। মেয়ে বলে—চুমু খাও আমায়। মা শোনেন চুমু খাওয়ার শব্দ! কিন্তু চোখে কিছু বা কাকেও দেখতে পান না! ছায়া পর্য্যন্ত নয়!

কদিন পরে আর এমন ঘটেনি—তবে বাপের জন্য মেয়ের মন যতখানি অধীর-চঞ্চল ছিল, তার সে-অধীরতা অনেকখানি কমেছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত বাপের কথা তুলে মেয়ে বলতো—বাবা স্বর্গে যায়নি। বাবা রাত্রে আমার কাছে এসে আমাকে আদর করবে, চুমু খাবে!

হানাবাড়ীর কাহিনী পূর্ব্বে বলেছি—তেমন আর একটি বাড়ীর কথা বলছি আবার। এ-বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে

এককালে খবরের কাগজে খুব লেখালেখি চলেছিল। এ-কাহিনীটির মর্ম্ম সঙ্কলিত করে দিচ্ছি :—

বাঙলার পল্লীগ্রাম···গ্রামে ইস্কুল···সেই ইস্কুলে এক ভদ্রলোক করেন মাষ্টারী—সেই সঙ্গে তখনকার বঙ্গবাসী পত্রিকায় মফস্বলের সংবাদ-দাতা রূপে গ্রামের কথা এবং নানা প্রবন্ধ তিনি লেখেন।

পয়সার অস্বচ্ছলতা। বাড়ীতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে—স্কুলে যে-মাহিনা পান, তাতে সঙ্কুলান হয় না। তিনি ব্যস্ত হলেন অন্য চাকরির সন্ধানে। খবরের কাগজে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখেন। একদিন বিজ্ঞাপন দেখলেন, পশ্চিম বাঙলার এক রাজা চান প্রাইভেট সেক্রেটারি···মাসে মাহিনা দেবেন আশি টাকা এবং বিনামূল্যে বাসস্থান।

বন্ধু-বান্ধবরা বললেন—রাজার সেক্রেটারি—জমিদারীতে চাকরি—বেশ দু'পয়সা উপরি পাবে···দরখাস্ত করো।

ভদ্রলোক দরখাস্ত করলেন এবং তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর হলো। চিঠি এলো—অবিলম্বে এসে জয়েন করুন।

বিদেশ—স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে যাবেন না স্থির হলো। যদি পোষায় তখন দেখা যাবে, এবং তার পর শুভদিন দেখে যাত্রা।

বাড়ী থেকে গরুর গাড়ীতে উঠে বসা···ষ্টেশনে পৌঁছুনো—ট্রেন এলো···ট্রেনে চড়ে কর্ম্মক্ষেত্রে আসা।

এসে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ। আলাপ-পরিচয়ে ভদ্রলোক বুঝলেন, ধনী জমিদার হলেও বেশ দরাজ ছাতি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে রাজা খুশী হলেন।

সেক্রেটারির থাকবার জন্য ব্যবস্থা হলো, রাজপুরীর মধ্যে

যে-কোনো কামরা পছন্দ হয়—একা মানুষ···সঙ্গে স্ত্রী-পুত্রাদি নেই তো।

রাজা বললেন—এখন ঐখানেই থাকুন···পরে স্ত্রী-পরিবার আনবেন তো···তাঁদের যখন নিয়ে আসবেন তখন যোগ্য ব্যবস্থা হবে। রাজা বললেন—শুনেছি, আপনার লেখা অভ্যাস আছে···আপনি কাব্য-নাটকের চর্চ্চা করেন। ভালো, আমিও সাহিত্য ভালোবাসি।

দেওয়ান বললেন—ওঁর জন্য দীঘির পাড়ে যে-বাড়ী··· সেটি ঠিক হবে। ছোট বাড়ী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চারিদিকে ফুলের বাগান···বাড়ীর পাশে অত বড় দীঘি।

রাজা বললেন—কিন্তু সে-বাড়ী! উনি নতুন মানুষ।

ভদ্রলোক বললেন—আলাদা বাড়ী হলেই ভালো হয়। আপনাদেরো তাতে কোনো অসুবিধা হবে না, আমারো না।

রাজা কি ভাবলেন···ভেবে বললেন—কিন্তু ও-বাড়ীর দুর্নাম আছে।

ভদ্রলোক বললেন—দুর্নাম! তার মানে?

দেওয়ান বললেন—মানে, ও-বাড়ীতে ভূত আছে।

ভদ্রলোক হাসলেন···হেসে বললেন—এ-যুগেও ভূত মানেন? আমি মানি না। আমাকে ঐ বাড়ীতেই থাকতে দিন। ভূতের বাড়ী শুনে আরো আমার ও-বাড়ীতে থাকবার ইচ্ছা।

রাজা বললেন—কিন্তু আপনি বুঝচেন না মশায়, বহুলোক যা প্রত্যক্ষ করেছে···ভয়ানক!

ভদ্রলোক বললেন—ভূত আমি মানি না। ভূত থাকলেও

আমি তাকে ভয়ানক মনে করি না। দয়া করে ঐ বাড়ীতেই আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিন।

রাজা বললেন—কিন্তু চাকর-বাকর রাত্রে যদি ও-বাড়ীতে না থাকতে চায়?

ভদ্রলোক বললেন—তারা থাকতে না চায় যদি আমি একা থাকবো।

তখন ঐ বাড়ী পরিষ্কার করিয়ে ভদ্রলোকের সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করা হলো।

রাত্রে আহারাদির পর একজন বেয়ারা চললো ভদ্রলোককে নিয়ে সেই বাড়ীতে। বাড়ীটি ছোট হলেও চমৎকার। ভদ্রলোক শুনলেন চাকরের মুখে, মনিব এ-বাড়ীটি তৈরী করিয়েছিলেন দীঘির ধারে ফুল-বাগানের মাঝখানে ...নিজে এখানে থাকবেন রাণী সাহেবাকে নিয়ে বলে। কিছুকাল তাই ছিলেন। তখন একটি মেয়ে হয়েছিল রাজা-বাহাদুরের। কিন্তু মেয়েটি ও-বাড়ীতে মারা যায়। তখন শোকে রাণী কাতর হন...এ-বাড়ী ত্যাগ করে যান। সেই অবধি এ-বাড়ী খালি পড়ে আছে...কেউ এখানে থাকে না—তবে সাজানো-গুছোনো যেমন ছিল, তেমনি আছে।

বেয়ারাকে তিনি বললেন—তুমি রাত্রে এখানে থাকবে না?

কাচুমাচু মুখে সে বললে—আজ্ঞে, সকলে বলে, এ-বাড়ীতে ভয় আছে। তাই—

হেসে ভদ্রলোক বললেন—বেশ, তুমি তাহলে এখানে থেকো না। আমি একা থাকবো...আমার ভূতের ভয় নেই।

বেয়ারা ব্যবস্থা করে চলে গেল। ভদ্রলোক টেব্‌ল্ ল্যাম্প জেলে দোতলার ঘরে বই খুলে পড়তে বসলেন। অনেক রাত্রি জেগে বই পড়া তাঁর অভ্যাস।

গভীর রাত্রি···চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ···ভদ্রলোক পড়ছেন···পড়ছেন··পড়ছেন—হঠাৎ আপনা থেকে তাঁর গা ছমছমিয়ে উঠলো···সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ! বই থেকে চোখ তুলে ঘাড় ফিরিয়ে চারিদিকে তিনি চাইলেন—কোথাও কিছু নেই! ঘরের দরজা ছিল বন্ধ—খিল আঁটা। কিছু না দেখে তিনি আবার কেতাবের পাতায় দৃষ্টি সংযোগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে দরজা গেল খুলে। তিনি চমকে উঠলেন! নিশ্চয় বাড়ীতে মানুষ ঢুকেছে! তিনি উঠলেন ···লণ্ঠন নিয়ে প্রত্যেক ঘর দালান নীচের তলা পর্য্যন্ত ঘুরে দেখলেন, সদরে লোহার খিল আঁটা···অন্য দু চারটে ঘরের দরজা তালাবন্ধ···ছাদের সিঁড়ির দরজা তালাবন্ধ—মানুষ আসবে কোথা দিয়ে?

ভদ্রলোক কোথাও মানুষজন না দেখে ফিরে নিজের ঘরে এলেন। এসে দেখেন, তিনি যে-চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন, সেই চেয়ারে বসে এক পরমাসুন্দরী যুবতী! ভদ্রলোক যেমন ঘরে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো এবং দাঁড়াবামাত্র বাতাসে মিলিয়ে গেল!

ভদ্রলোক হতভম্ব··বেশ কিছুক্ষণ! তারপর সে-চেয়ারে বসবার ভরসা হলো না·· অন্য চেয়ার টেনে তাতে বসলেন। বসে চিন্তা, তাইতো··ভূত তাহলে আছে! সকলে বলছেন···তাছাড়া যা দেখলুম, ভৌতিক মূর্ত্তি ছাড়া সে আর অন্য কিছু হতে পারে না!

মনে বেশ দুশ্চিন্তা—একা এ-বাড়ীতে কি করে থাকবেন! ভূত দেখা দিয়ে গেল! তা দেখেও—

এমনি ভাবছেন একাগ্র মনে···হঠাৎ কণ্ঠস্বর শুনলেন। শুনলেন কে বলছে—ভূত তুমি মানো না! না-মানা ভুল! কিন্তু তোমার ভুলে আমার উপকার হলো।

ভদ্রলোকের বুক ঢিপঢিপ করছে—স্বর লক্ষ্য করে তিনি সেই দিকে তাকালেন। দেখলেন, সেই সুন্দরী! দেখে ভয়ে ভদ্রলোক কাঁটা।

মূর্তি বললে—তোমার সাহস আছে। এ-বাড়ীতে রাত্রে কেউ আসে না···থাকা তো দূরের কথা। এ বাড়ীতে আমি আছি। কি যাতনা ভোগ করছি বলবার নয়। এ-যাতনা থেকে যদি মুক্তি পাই, এজন্য মানুষ পেলে তাকে নিজের কথা বলবার জন্য আমি আকুল।

মূর্তি বলতে লাগলো—যে-পাপ করেছি, যাতনা পেতেই হবে। এ-বাড়ীতে আমি ছিলুম বাপের আদরের মেয়ে। কিন্তু পাপ করেছিলুম, তার ফলে সন্তান-সম্ভবা হই। তার পর লুকিয়ে ওষুধ খেয়েছিলুম, তার ফলে হয় মৃত্যু। আমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারো? দেখবে আমার সে-পাপের ফল?

এ-কথা বলে সুন্দরী নিজের বুক চিরে বার করলো এক শিশু।

দেখে ভদ্রলোক 'কানাই' বলে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যান।

সেই বেয়ারার নাম 'কানাই'।

যখন জ্ঞান হলো, তখন তিনি বুঝলেন, এখনো ভোর হতে

দেরী আছে। তিনি আর এক মিনিট সেখানে রইলেন না···লণ্ঠন হাতে বাড়ী ছেড়ে বেরুলেন···চললেন রাজপুরীর দিকে।

দেউড়িতে বসে বাকি রাত কাটালেন; তার পর সকালে রাজাকে এ-কথা তিনি বলেন।

শুনে রাজা চুপ করে রইলেন। তার পর কি হলো, সে-বিষয়ে ভদ্রলোক আর কোনো কথা লেখেননি।

এ-ব্যাপার নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি হয়েছিল—সেই লেখা থেকে এ-কাহিনী সঙ্কলিত করে দিলুম।

এবার একটি বিদেশী কাহিনী বলি। এ-কাহিনীর অপূর্ব্বত্ব অস্বীকার করা চলে না।

বিলাতের ডারহাম···সেখানে ওয়েষ্টার্লি ষ্ট্রীটে এক কৃষিজীবীর বাস···তার নাম ওয়াকার। ওয়াকারের স্ত্রী মারা গেলে তার এক দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়া—আন···এসে তার সংসার-পরিচালনার ভার নেয়। দিন মন্দ চলছিল না। কিন্তু একদিন কি কারণে ওয়াকারের সঙ্গে আনের হয় দারুণ ঝগড়া—তখন ওয়াকার কোনো কাজের মিথ্যা ছলে সার্প নামে তার এক লোকের সঙ্গে আনকে দূরে পাঠায়···আর সেই সঙ্গে সার্পকে চুপি চুপি বলে দেয়—ওর মুখ যেন আমি আর না দেখি!

এর পর আনকে কেউ আর চোখে দেখেনি!

ওয়াকারের বাড়ী থেকে ছ মাইল দূরে এক ভদ্রলোকের বাস···তাঁর নাম গ্রেহাম। আন চলে যাবার প্রায় এক বছর পরে গ্রেহাম একদিন কাছাকাছি একটা পাহাড় থেকে নামছেন ···নেমেই দেখেন, পথের ধারে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক।

—কে এখানে? স্ত্রীলোকটিকে এ প্রশ্ন গ্রেহাম করেন।

তখন স্ত্রীলোক দিলে জবাব—ওয়াকারের বাড়ীতে ছিল আন···আমি তার প্রেতাত্মা। ওয়াকারের কথায় তার লোক সার্প আমাকে শাবলের ঘায়ে মেরে ফেলেছে। ঐ কয়লার খনি···মারবার পর ওখানে এক জায়গায় আমার দেহ পুঁতে রেখেছিল। কঙ্কাল এখনো আছে। সে যখন আমাকে মারে, তখন আমার পোশাকে রক্ত লাগে। কঙ্কালের গায়ে দেখবে আমার সে-পোশাক, রক্তের দাগ মিলিয়ে গেলেও বিশ্রী দাগ দেখবে সে-পোশাকে। সেগুলি উদ্ধার করে যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এ-কথা বলো, তাহলে আমার খুব উপকার হয়। করবে এ-কাজ?

পরের দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে গ্রেহাম এ-কাহিনী বলেন। শুনে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে সে-জায়গা খোঁড়া হয়···খোঁড়া হলে পাওয়া যায়, দাগ-লাগা পোশাক-জড়ানো কঙ্কাল!

এ-ঘটনা ঘটে ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে এবং অগষ্ট মাসে এ-মামলার বিচার হয়। কঙ্কাল পাওয়া যাবার পরেই ওয়াকার এবং সার্পকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। দুজনেই অপরাধ স্বীকার করেছিল এবং আনকে হত্যা করার অপরাধে দুজনেরই চরম শাস্তি হয়েছিল।

ভূতে পাওয়ার বহু কাহিনী শুধু আমাদের দেশেই নয়, বহু দেশে চলিত আছে। এদেশের একটি কাহিনী বলছি।

বাঙলার এক গ্রাম···গ্রামের এক যুবকের যুবতী স্ত্রীকে

ভূতে পেয়েছিল। সে কখনো হাসতো, কখনো কাঁদতো, কখনো গান গাইতো, আবার কখনো ভয় পেয়ে দারুণ চীৎকার করতো। হিষ্টিরিয়া বলে অনেক চিকিৎসা হলো··· কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তখন রোজা ডেকে ব্যবস্থা।

রোজা এসে তার তুক-তাক ব্যবস্থা করলো···করে বধূকে বললে—তুমি কে? কেন একে যাতনা দিচ্ছ?

বধূর মুখে জবাব হলো—আমি!···দুর্বাষ্টমীর দিন ভোরে এ নতুন কলসী নিয়ে ঘাটে যায় জল আনতে···তখন আমার লোভ হলো, তাই একে পেয়েছি।

—তোমার গতি হয়নি বুঝি? প্রেত হয়ে আছো?

জবাব: সে-কথায় দরকার কি? আমি যে-জ্বালা সহ্য করছি, তার শোধ নিতে চাই।

—এ তো তোমার কাছে অপরাধী নয়···একে কেন যাতনা দাও? কি তুমি চাও, বলো?

—বলবো না।

রোজা তখন ধমক দিয়ে বললে—যদি না বলো···আর যদি একে না ছাড়ো, তাহলে তোমাকে ভয়ানক সাজা দেবো।

জবাব: বলছি। এর স্বামী—আমি যখন বেঁচে ছিলুম, আমার অনেক শত্রুতা-সাধন করেছে। মরেও আমি তা ভুলিনি।

রোজা: এখন তো সবাই জানলো···এবার একে ছাড়ো।

—না, ছাড়বো না। একে পেয়ে আমি বেশ ভালো আছি।

রোজা বললে—বটে! ছাড়বে না? আমি সর্ব্বেবাণ ছুড়বো।

—না…না…না। বৌ বলে উঠলো কাতর কণ্ঠে। সে বললে—আমি যাবো…যাবো।

রোজা বললে—হ্যাঁ, চটপট যাও…দেরী নয়…নাহলে তোমার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেবো।

—না না, আমি যাচ্ছি। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ…জুতো পরিয়ো না।

সেখানে পাড়ার অনেক লোক জমায়েৎ ছিলেন…একজন বললেন—উনি 'অমুক' হন, বলুন তো গান গাইতে। সে খাশা গান গাইতো।

রোজা বললে—একখানি গান গেয়ে শোনাতে হবে।

—কি গান?

একখানা গানের ফরমাশ হলো। জীবিতকালে যে-গান প্রায় গাইতো, সেই গান।

বৌ অমনি গান ধরলো…চমৎকার গাইলো। অথচ বেচারী কুলের বধূ গান জানে না, কখনো গান গায়নি…সে নিজে কি গান গাইবে?

সকলে শুনলো…শুনে অবাক…বললে—তারি গলা… আজো আমাদের মনে আছে।

গান শেষ হলে রোজা বললে—এবারে যাও।

—যাচ্ছি।

—কি করে জানবো, তুমি গেলে?

এক-ঘড়া জল আনা হলো। রোজা বললে—দাঁতে চেপে

ঐ ঘড়া বাহিরের উঠানে নিয়ে গিয়ে রাখো···তাহলে বুঝবো, গেলে।

রোজার কথায় সেই যুবতী বৌ তখন জলভরা ঘড়া··· কাঁখালে নয়, হাতে ধরে নয়···দাঁতে চেপে নিয়ে উঠানে গেল···সেখানে ঘড়া রাখলো···রাখবার সঙ্গে সঙ্গে বৌ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

এমন কাহিনী আমরাও অনেক শুনেছি···একটির উল্লেখ করলুম।

আর একটি ছোট্ট কাহিনী—

ইচ্ছামতী নদী···নদীর তীরে কালীতলার ঘাট প্রসিদ্ধ··· সেই ঘাটে বহুকাল থেকে দশ মণ ওজনের ভারী একখানি পাথর পড়েছিল। পাথরটি ভারী অদ্ভুত! দিনের বেলা পাথরখানা দেখা যেতো ঘাটে···কিন্তু কোনো-কোনোদিন দেখা যেতো, কালীতলার ঘাট ছেড়ে ও-পাথর পড়ে আছে রামরাজার ঘাটে। এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটের ব্যবধান কমপক্ষে তিন-চারশো হাত। কে এ-পাথর নিয়ে যায়—তার জন্য গ্রামের লোকজনের কৌতূহলের সীমা নেই! নিশ্চয় ভূতুড়ে কাণ্ড!

এ-ব্যাপারের মীমাংসার জন্য গ্রামের কজন লোক একদিন রাত্রে ঘাটে বসলো পাহারাদারী করতে। পাঁচ-সাত রাত্রি পাহারা চললো। এ-কদিন যে-ঘাটের পাথর, সেখানে সে-পাথর রইলো—ঠাঁইনাড়া হলো না।

গ্রামের এক প্রাচীন ব্যক্তি বললেন—বহুকাল পূর্ব্বে কোথা থেকে এখানে এক সাধু এসেছিলেন, তিনি ঐ

পাথরে বসে জপতপ করতেন…তার পর তিনি মারা যান। সেই সাধু নিশ্চয় ভূত হয়ে এখানে আছেন। তিনিই নিশ্চয় পাথর নাড়ানাড়ি করেন। এ-খবর শুনলেন জেলার সাহেব হাকিম। শুনে তিনি পাথরখানা নৌকায় তুলিয়ে ওখান থেকে সরাবার চেষ্টা করেন (দশ-বারো বছর পূর্ব্বেকার কথা)। কিন্তু নৌকায় তোলবার সময় পাথরখানি জলে পড়ে যায়…বহু সন্ধানেও সে-পাথর আর পাওয়া যায়নি।

আগে যে-সব কাহিনীর উল্লেখ করেছি, সে-সব কাহিনীতে ভয়-সংশয় প্রভৃতির যে-আভাস পাই, তা যেমন কৌতূহলের উদ্রেক করে, তেমনি সে-সব কাহিনী পড়ে আমাদের মনে হয়, নশ্বর দেহ ত্যাগ করে গেলেও ইহলোকের সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক নিঃশেষ হয় না। আত্মীয়-পরিজনের উপর স্নেহের পরিচয় পাই কয়েকটি কাহিনীতে।

আত্মীয়-সম্পর্ক ভিন্ন পরলোকগত অপর আত্মারও এমন স্নেহ-মমতার বহু পরিচয় পাই—এমন কয়েকটি কাহিনী এবার বলছি।

টুইডেল সাহেবের কথা পূর্ব্বে বলেছি। পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে অবিশ্বাস ছিল অপরিসীম—যেভাবে এ-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ-সৃষ্টি হলো, সে-কথা পূর্ব্বে বলেছি। তিনি লিখেছেন—তাঁর স্ত্রী তখন অন্তর্বত্নী। সকলের মনে আশা, পুত্রসন্তান হবে। এমন কি, প্রসবের মাসখানেক পূর্ব্বেও বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা তাই বলেছিলেন। কিন্তু প্রসবের দিন-পনেরো পূর্ব্বে টেবিলের পায়া ঠোকায় প্রেতাত্মা বলেন—না, কন্যা হবে। এবং সেবারে তাঁর একটি কন্যা হলো।

শুধু এইটুকু নয়, এই কন্যাটির জন্মের পর তার উপর অদৃশ্য স্পিরিটের স্নেহ-মায়ার পরিচয়ও তাঁরা পেয়েছিলেন। কন্যার বয়স তখন এক বছর—ঘুমন্ত শিশুকে তার ছোট খাটে শুইয়ে মা অন্য ঘরে কি কাজ করছিলেন—দোতলার ঘর···দোতলায় কোনো মানুষজন ছিল না···হঠাৎ কন্যা কেঁদে উঠলো। হাতের কাজ ফেলে মা এলেন মেয়ের কাছে··· ···এসে দেখেন, তার মশারি তোলা এবং কানে শুনলেন ঝুমঝুমির আওয়াজ···একেবারে মেয়ের খাটের কাছে। অথচ চোখে মানুষ দেখলেন না···ঝুমঝুমিও দেখলেন না! তাঁরা আরো লক্ষ্য করেছিলেন, কোনোদিন হয়তো কাচের বাসনকোসন ধুয়ে-মুছে কে যেন ও-ঘরে সেগুলি গুছিয়ে রাখছে—গুছিয়ে রাখার শব্দ। সে-ঘরে গিয়ে দেখেন, ঘরে মানুষ নেই···অথচ বাসনকোসন ধুয়ে মুছে চমৎকার গুছোনো রয়েছে। মিসেস টুইডেল অনেক সময় চলতে ফিরতে অঙ্গে অদৃশ্য অঙ্গুলি-স্পর্শ অনুভব করেছেন বেশ স্পষ্ট!

এ-ব্যাপারের বিজ্ঞান-সম্মত মীমাংসা কে করবে?

আমাদের দেশের মনস্বী সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে এমন বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল···কয়েকটির উল্লেখ করি!

বিজয়কৃষ্ণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন; আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রবল এবং তিনি এ সম্বন্ধে নিষ্ঠাভরে অনুশীলন করতেন।

দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণের চিকিৎসার বহু অপূর্ব্ব কাহিনী আমরা বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি। এক বোনেদী ঘরের কুলবধূর

সাংঘাতিক পীড়া হয়েছিল। তাঁর পেট প্রত্যহ ফুলে জয়ঢাক হয়ে থাকতো। ঔষধ খাইয়ে, তার্পিণ মালিশ করে সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্য ঘটলেও সারবার নাম ছিল না—অবশেষে দুর্গাচরণের ডাক পড়লো। তিনি রোগী দেখলেন, রোগীকে নানা প্রশ্ন করলেন…তার পর যেন চিন্তা করছেন, এমনি ভাব দেখিয়ে বাড়ীর কর্ত্তাদের বললেন—বেশ ভালো করে তামাক সেজে আমাকে দিয়ে যান। আমি তামাক খেতে খেতে ঔষধ চিন্তা করি। তখনি ভালো তামাক সাজিয়ে দুর্গাচরণের সামনে গড়গড়া দেওয়া হলো। তিনি বললেন—এ-ঘরে আর কেউ থাকবেন না…শুধু রোগী আর আমি… দরজা ভেজিয়ে আপনারা বাইরে থাকবেন। তাই হলো। …তখন রোগিনীকে দুর্গাচরণ বললেন—তোমার অসুখ বুঝেছি, মা। তামাক খাওয়া অভ্যাস করেছো—শ্বশুরবাড়ীতে লজ্জায় তা বলতে পারো না…তামাকও খেতে পারো না! এখন এই সাজা তামাক টানো…কেউ জানবে না। বৌ লজ্জায় অভিভূত হলেও স্বীকার করলেন, তাই; এবং গড়গড়ার নল টেনে তিনি তামাক খেলেন। উদরের ব্যাধির উপশম হলো। তার পর বাড়ীর লোকজনকে ডাকিয়ে দুর্গাচরণ ব্যবস্থা করলেন—এ বড় বিষম বায়ু-রোগ। এ-রোগের একমাত্র ঔষধ—প্রত্যহ দুপুরে এঁর খাওয়া-দাওয়ার পর ভালো এক ছিলিম তামাক সেজে এঁকে ধূমপান করতে দিতে হবে। তামাকের ধোঁয়া ছাড়া এ-ব্যাধি সারবে না।

বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা মানার পর থেকে বধূর আর কোনো উপসর্গ ঘটেনি।

ছেলেবেলায় শোনা একটি কাহিনী বললুম...এমন বহু কাহিনী আমরা শুনেছি। এখন বিজয়কৃষ্ণর কথা বলি :—

দুর্গাচরণের উপর বিজয়কৃষ্ণর অপরিসীম ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল। দুর্গাচরণ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। দুর্গাচরণের মৃত্যুর পরেও বহু রোগের চিকিৎসায় দুর্গাচরণের প্রেতাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা হদিশ দিয়েছিলেন। কয়েকটি কাহিনী বলি। রাত্রে বিছানায় শোবার সময় বিছানায় বিজয়কৃষ্ণ কাগজ-পেন্সিল রাখতেন এবং কোনো রোগের চিকিৎসার সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানবার প্রয়োজন হলে তিনি সে বাসনা মনে মনে জানাতেন দুর্গাচরণকে স্মরণ করে...তাঁর উদ্দেশে।

বিজয়কৃষ্ণ তখন শান্তিপুরে...সেখানে কলেরার এপিডেমিক দেখা দিয়েছে...বহু লোক মারা যাচ্ছে। বিজয়কৃষ্ণ রাত্রে স্বপ্নাদেশ পেলেন। বিছানায় তিনি পেলেন দুর্গাচরণের স্পিরিটের হাতের লেখায় ব্যবস্থা-নির্দেশ এবং সেই নির্দেশ মতে যতগুলি রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন, তাদের সবগুলি তাঁর সে-চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেছিল।

ব্যবস্থাপত্রে কৃমিনিবারক সেণ্টনাইন এবং সোডা—এই দুটি ঔষধের নাম লেখা ছিল শুধু। তাতেই সেবারকার কলেরা-এপিডেমিকের অবসান হয়।

কথিত আছে—দুর্গাচরণের স্পিরিটই বিজয়কৃষ্ণকে স্বপ্নে বলেছিলেন, চিকিৎসা-ব্যবসা করলে তোমার চলবে না, বাপু! লোকের ভবব্যাধি যাতে সারে, সে-ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। সেই স্বপ্নাদেশ পেয়েই তিনি নাকি চিকিৎসা-ব্যবসা ছেড়ে ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ স্বামিজীকে তাঁর এক শিষ্য একবার প্রশ্ন করেছিলেন—প্রেতযোনি সত্যই আছে? উত্তরে স্বামিজী বলেছিলেন—সত্যই আছে। তুই যা দেখিস না...ভাবিস, তার অস্তিত্ব নেই! তোর দৃষ্টির বাইরে অযুতাযুত কত ব্রহ্মাণ্ড দূর-দূরান্তরে ঘুরছে। তুই দেখতে পাস না বলে তাদের অস্তিত্ব নেই?

স্পিরিট ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন—এমন বিশ্বাস অনেকের আছে। কিন্তু যাঁরা পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে রীতিমত অনুশীলন করেন, স্পিরিটদের সঙ্গে নিত্য যাঁদের যোগাযোগ ...তাঁরা বলেন—স্পিরিটরা ভবিষ্যৎবাণী করতে চান না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁরা যা বলেন, তা তাঁদের ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার জোরে বলেন। ওঁদের দূরদর্শন এমন নিখুঁৎ এবং অভ্রান্ত যে তাঁদের বাণী সত্য হয়েই অধিকাংশ সময়ে দেখা দেয়। তবে যে-সব মানুষ বেঁচে আছেন, তাঁদের মধ্যে কারো-কারো স্বভাব অতিরঞ্জন করা, স্পিরিটদের মধ্যেও এমন স্বভাব অনেক স্পিরিটের আছে... এই অতিরঞ্জন করার স্বভাব!

সাত

স্পিরিটের ফটো

১৯০৬-০৭ সালের কথা:—

ভবানীপুরে বলরাম বোস ঘাট রোডে থাকতেন আমার বাল্যবন্ধু এবং সতীর্থ নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় (এখন নলিনীমোহন শাস্ত্রী)। তাঁর কাছে আমি হামেশা যেতুম...

তিনিও আসতেন আমার গৃহে হামেশা। একদিন বৈকালে তাঁর ওখানে যেতে দেখি, হৈ-হৈ কাণ্ড! ব্যাপার কি?

তিনি একখানি ফটো-প্রিণ্ট দেখালেন…এক ভদ্রলোকের ফটো। কিন্তু তাঁর ছবির পিছনে ছায়ার আভাসে এক স্ত্রীলোকের মূর্ত্তির আভাস বেশ স্পষ্ট! শুনলুম, এ-ভদ্রলোক তাঁদের একটি বাড়ীর ভাড়াটিয়া…সরকারী চাকরি করেন—তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন ক'মাস আগে…তখন তিনি ছিলেন অন্য বাড়ীতে। স্ত্রী মারা যেতে ভদ্রলোক নলিনীর এ-বাড়ীতে এসে আজ ক' মাস বাস করছেন। দুদিন আগে তিনি নিজের ফটো তুলিয়েছেন…তাঁর ঐ বাড়ীতে। এ-ফটো পাঠাতে হবে গ্রামে থাকেন তাঁর বিধবা মা…মার কাছে—মার একান্ত আগ্রহ। ফটো-প্রিণ্ট হতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর ছবির পিছনে ছায়ারূপিণী ঐ যে রমণীর আভাস স্পষ্ট রেখায় ফুটেছে…এ-মূর্ত্তি তাঁর মৃতা পত্নীর!

আমাদের দেহ রোমাঞ্চিত হলো। সে-ভদ্রলোক এবং আরো অনেকে সেখানে-উপস্থিত ছিলেন। শুনলুম, এ-বাড়ীতে আসা ইস্তক ভদ্রলোক একা নন…বাড়ীর অন্য লোকজনও সন্ধ্যার পর বাড়ীতে সঞ্চরণশীল এক ছায়ামূর্ত্তি দেখেন—ফটোয় তাঁর ছবি অর্থাৎ প্রেতাত্মার ছবি! সকলের বিস্ময়ের সীমা নেই।

মনে আছে, এ-ছবির প্রিণ্ট তখন অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে পাঠানো হয়—সেখানে তাঁরা পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করেন…তাঁরা যদি এ-ছবি দেখে কোনো মীমাংসা করতে পারেন।

আমার মনে আছে, তখন সে-ফটো নিয়ে শহরে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। খবরের কাগজে এ-খবর পড়ে অনেকে এসেছিলেন ভদ্রলোকের গৃহে সে-ফটো দেখতে!

যাঁরা পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করেন…তাঁরা বলেন, এ-ফটো তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়!

এ-সম্বন্ধে টুইডেল সাহেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে সব কথা লিখেছেন, তা শুধু কৌতূহল উদ্রেক করবে না…মনকে এ-বিষয়ে রীতিমত সচেতন করবে।

তিনি লিখেছেন—১৯২৫ সালের ৮ই জুলাই তারিখ… বৈকালে গ্রীন হাউসে তাঁর স্ত্রী ম্যাজ এবং কন্যা ডোরোথি প্লাঞ্চেট নিয়ে বসেছিলেন। প্লাঞ্চেটে স্পিরিটের আবির্ভাব এবং স্পিরিটের নাম জানা হলো—তার নাম ষ্ট্রাডিয়ুয়ারিশ। স্পিরিট লিখলেন কাগজে—যদি ডোরোথি ক্রু-শহরে যেতে পারে, তাহলে এ-স্পিরিটের ফটো সে তুলতে পারবে। কিন্তু তখন ক্রুতে যাওয়া ডোরোথির পক্ষে সম্ভব হয়নি…কাজেই এ-ব্যাপার ঐখানেই স্থগিত রইলো।

তার পর ১৯২৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে… টুইডেল এক পত্র পেলেন…ক্রু-শহরে এক ভদ্রলোক স্পিরিটের ফটো তোলেন, তাঁর কাছ থেকে। ফটোগ্রাফার লিখেছেন— সেখানকার ওঁটলি মহল্লায় অধ্যাত্মতত্ত্বের এক সভা হবে… টুইডেল যেন সে-সভায় আসেন। সে-ষ্ট্রাড-স্পিরিটের কথা তখন তাঁরা ভুলে গেছেন। হঠাৎ এ-চিঠি পেয়ে তিনি অবাক হলেন। ওঁটলির এ-ফটোগ্রাফার তাঁর নাম কি করে জানলেন…জেনে ওঁটলিতে তাঁকে হঠাৎ যেতে বললেন কেন?

সেখানে টুইডেল গেলেন এবং শুনলেন, এক ভদ্রলোক আছেন—মিষ্টার রাইক্রফট্…তাঁর কাছে আছে তাঁর পরলোকগতা কন্যার ফটো! কন্যার জীবিতকালের ফটো বা জীবিতকালের তোলা ফটোর কপি নয় এবং এ-ফটো উঠেছে রাইক্রফটের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

এ-ফটো তুলেছেন মিষ্টার হোপ। শুনলেন, হোপের নাকি আশ্চর্য্য ক্ষমতা…স্পিরিটের ফটো তাঁর প্লেটেই ওঠে।

তখন হোপকে নিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা হলো—১৩ই জানুয়ারি তারিখে (১৯২৬) টুইডেলের কর্ম্মস্থলে। নতুন প্লেট কিনে আনা হলো, সাটারের ভিতর দিয়ে সে-সব প্লেটে নাম সহি করা হলো এবং প্লেটগুলি হোপের অসাক্ষাতে এঁরাই করলেন লোড। ছবি তোলার পর হোপকে সরিয়ে রেখে এঁরা করলেন সে-সব প্লেট ডেভেলপ…অর্থাৎ সকল দিকে হুঁশিয়ার হয়ে ব্যবস্থা। যে-ক্যামেরায় ছবি তোলা হলো, সেটিও এঁদের ক্যামেরা…হোপের নয়। ছবি তোলার আগে প্ল্যাঞ্চেটে স্পিরিট আনা হয়েছিল…ক'জনে আলাদা আলাদা স্পিরিট আনিয়েছিলেন—মিসেস টুইডেল আনিয়েছিলেন তাঁর পরলোকগত সহোদর জ্যাকের স্পিরিটকে।

প্লেট ডেভেলপ হলে দেখা গেল, তিনখানি প্লেটেই এক সুশ্রী তরুণের চেহারা…চতুর্থখানিতে ঐ তরুণ এবং তার সঙ্গে এক তরুণীর ছবি! শেষে দেখা গেল, ঐ তরুণী মিসেস টুইডেলের মায়ের কিশোর বয়সের মূর্ত্তি। তাঁর মা মারা গিয়েছিলেন চুরাশি বছর বয়সে…আর ঐ তরুণের

ছবি এক আর্টিষ্টের—তরুণ বয়সে ঐ আর্টিষ্টের সঙ্গে মিসেস টুইডেলের মায়ের বিবাহ স্থির হয়েছিল। কিন্তু অভিভাবকরা সে-বিবাহে মত দেননি…আর্টিষ্টের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না বলে। পরলোকে দুজনে এখন পাশাপাশি আছেন…সে পরিচয় দিলেন ফটোর প্লেটে!

যে-স্পিরিট ষ্ট্রাডিয়ুয়ারিশের উল্লেখ করা হয়েছে, একটা প্লেটে তাঁর স্পিরিটের ছবি উঠেছিল। প্লাঞ্চেটের নির্দ্দেশে এ-ছবির পরিচয় জানা যায়—ষ্ট্রাডিয়ুযারিশ মারা গেছেন ১৭৩৭ সালে… অর্থাৎ প্লাঞ্চেট এবং ফটো নেবার একশো সাতাশি বছর পূর্ব্বে। প্লাঞ্চেটে এ-স্পিরিটকে প্রশ্ন করতে উত্তর পাওয়া যায়—তরুণ বয়সে ষ্ট্রাডিয়ুয়ারিশের চেহারা ছিল অবিকল ঐরূপ। হোপ এর পূর্ব্বে তাঁর যে-ছবি প্লেটে পেয়েছিলেন, সে-ছবি তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের সময়কার।

এ-ব্যাপার থেকে স্পিরিটের অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় পাই!

অধ্যাত্ম-তত্ত্বে হোপের শক্তি লাভ হয়েছিল অসাধারণ রকম। ঐ রাত্রের কথা…সকলে খেতে বসেছেন—খেতে খেতে সকলে গল্প করচেন…হঠাৎ হোপ তাঁর কাঁটা-চামচ রেখে গম্ভীর হয়ে বসলেন। সকলে প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি? হোপ বললেন—এখানে একজন মহিলা আছেন। টুইডেলরা বললেন—তার চেহারার বর্ণনা দিন। তিনি যে-বর্ণনা দিলেন, তার সঙ্গে মিললো টুইডেলের পরলোকগতা মাসির চেহারা। টুইডেলের মাসিকে হোপ জীবনে কখনো দেখেননি…তাঁর কথা প্লাঞ্চেট-বৈঠকে কেউ চিন্তাও করেননি আজ! আজকের আসরে সকলেই পরলোকগত

আপনজনদের স্পিরিট আনিয়েছিলেন সত্য, তাঁদের মধ্যে টুইডেলের মাসির চিন্তাও কেউ করেননি!

এর ব্যাখ্যা-সূত্রে হোপ বলেছিলেন—অন্য আপনজনদের সঙ্গে উনিও এসেছিলেন···আলাপ-আলোচনার বাসনা তাঁরও ছিল। কিন্তু তাঁকে না চাওয়ার দরুণ ব্যর্থমনোরথ হন। তবু সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারছিলেন না···তাই এ-ঘরে এসেছেন। এর পরের দিন প্লাঞ্চেটে ওঁর স্পিরিট আনিয়ে ছবি তোলা হয়—প্লেটে ওঠে তাঁর ছবি। মাসির নাম এলিজাবেথ কোটস। মৃত্যুর তিন-চার মাস পূর্ব্বে তাঁর চেহারা যেমন ছিল, প্লেটে হুবহু সেই ছবি ওঠে।

প্লাঞ্চেটে প্রায় নিত্য দিন চলে অটো-রাইটিং। এর ফলে এ-পরিবারের সঙ্গে স্পিরিটদের এমন অন্তরঙ্গতা হলো যে টুইডেলের স্ত্রী ম্যাজ মাঝে মাঝে স্পিরিটের করস্পর্শ উপলব্ধি করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, ধূম-বাষ্প-আলোর রেখায় তিনি বিভিন্ন বিচিত্র মূর্ত্তিও দেখতে লাগলেন।

এ সম্বন্ধে ১৯০০ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের দিনলিপিতে মিষ্টার টুইডেল এক অপূর্ব্ব কাহিনী লিখেছেন:

তিনি লিখেছেন—গভীর রাত্রে ঘুমোচ্ছি···আমার স্ত্রী ঠেলা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙালেন। জেগে উঠে বসতেই তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে খাটের পায়ের দিকে চেয়ে দেখবার ইঙ্গিত করলেন। তিনি বললেন—ট্রাডের ছায়ামূর্ত্তি তিনি দেখেছেন···ঐখানে! ট্রাড বারবার মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালেন। প্লেটে ট্রাডের যে-ছবি উঠেছে, অবিকল সেই ছবির চেহারা! ট্রাড প্লাঞ্চেটে অটো-লেখায় কদিন জানিয়েছেন, একটা কামরা ফিট করতে—

সে-কামরার দেয়ালে নীল রঙের কাগজ মেরে দিতে হবে··· আর ভায়োলেট রঙের পর্দ্দা থাকবে দরজায়-জানলায়। তিনি জানিয়েছেন, ঐ রঙটা তিনি খুব ভালোবাসেন। তাছাড়া আরো জানিয়েছেন—আমি যে-বেহালা বাজাই, সে-বেহালাও যেন ঘরে কোনো হুকে ঝোলানো থাকে—সেই কামরায় যেন আমরা বসে চক্র রচনা করি।

১৭ তারিখে—সকাল বেলা···সকলে বসে একসঙ্গে চা খাচ্ছেন। ম্যাজ হঠাৎ বলে উঠলেন—ষ্ট্রাড এসেছেন! তাঁর মূর্ত্তি তিনি দেখেছেন···আগের রাত্রের মতো···বার বার ষ্ট্রাড অভিবাদন করেছেন ম্যাজকে। এ-কথা শুনে টুইডেলও মাথা নামিয়ে তাঁর উদ্দেশে অভিবাদন জানালেন।

এর পর ২৮শে মার্চ তারিখের দিনলিপি। টুইডেল লিখেছেন—আজ বহুদিন পরে ষ্ট্রাড আবার এসেছেন। ম্যাজ আর ডোরোথি প্লাঞ্চেট নিয়ে বসেছিলেন। ষ্ট্রাড এই কথাগুলি লিখেছেন—ডোরোথির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আছেন তার ন' বছর বয়স থেকে। একদিন সিঁড়িতে নামবার সময় তাঁর সঙ্গে ম্যাজের ধাক্কা লেগেছিল···সে এই ক-বছর আগেকার কথা (ম্যাজ এ-কথা তখনি বলেছিলেন)! ডোরোথি জন্মাবার সময় যে নূতন দাসী পাওয়া গিয়েছিল, ষ্ট্রাডই তাকে এনে দিয়েছিলেন। ষ্ট্রাড এ-বাড়ীর ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান নিত্য এবং মাঝে মাঝে মজা করবার জন্য বাগানে বেড়ার ধারে চাকর-বাকরদের সামনে দেখা দিয়ে তাদের ভয় দেখিয়ে-ছিলেন।

এই ষ্ট্রাডের যে-পরিচয় টুইডেল পেয়েছিলেন প্লাঞ্চেটের লেখায়, তার মর্ম্ম: তাঁর পিতার নাম আনেজাস্তো। ষ্ট্রাডের

জন্ম হয় ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে…মায়ের নাম আনা মোরোনি। জন্ম ক্রোমোনা শহরে। মা-বাপ প্লেগে মারা যান। ১৬৬৭ সালে ৪ঠা জুলাই তারিখে বিবাহ। স্ত্রীর নাম ছিল ফ্রানসেশকা… স্ত্রীর বাপের নাম ফেরাবশি। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। ১৬৬৮ সালে কন্যার জন্ম…কন্যার নাম মারিয়া। ব্যবসা ছিল বেশ লাভের।

এ সম্বন্ধে টুইডেল সাহেব সন্ধান নিয়েছিলেন এবং সংবাদ সত্য বলেই তিনি প্রমাণ পেয়েছিলেন। যে-বাড়ীতে জীবিতকালে ষ্ট্রাড বাস করতেন, সে-বাড়ীর নক্সা ও ফটোও তিনি নিয়েছিলেন…১৯৩০ সালে। সে-বাড়ীতে তখন অবশ্য অন্য লোকের বাস। ৯৫ বছর বয়সে ষ্ট্রাডের মৃত্যু হয়…অর্থাৎ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে। এ-খবরও মিলেছিল।

ষ্ট্রাডের স্পিরিটের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা খুব নিবিড় হয়েছিল। ষ্ট্রাডের স্পিরিট অনেক সময় কবিতা লিখে প্রশ্নের জবাব দিতেন। ১৯৩০ সালের ২৪শে মে তারিখের দিনলিপিতে টুইডেল লিখেছেন—চক্রে ডোরোথি করলে প্রশ্ন—আপনি অনেককাল পরলোকে আছেন? জবাবে লেখা হলো—

As yesterday I sat on a stool
With candlelight in the gloom
Making my fiddles supreme
Those years seem to me like a dream.

অর্থাৎ কাল যেন আমি আমার বাঁশী নিয়ে টুলে বসে-ছিলুম…অন্ধকার ঘরে বাতি জ্বলছিল…বাঁশীটিকে সর্ব্বস্ব করে আমি বসেছিলুম…সে-সব অতীত দিনের কথা মনে হয় যেন স্বপ্ন!

এর পর দিনলিপিতে ২রা জুলাইয়ের কথা :

ষ্ট্রাডের কথামত বাড়ীর একটি কামরা যথারীতি সাজানো—দেয়ালে নীল রঙের কাগজ আঁটা…দরজা-জানলায় ভায়োলেট রঙের পর্দা—প্ল্যাঞ্চেটে বসেছেন ম্যাজ, ডোরোথি এবং টুইডেল। ডোরোথির হাতে পেন্সিল··ডোরোথি লিখলো—পর্দা সরাও টুইডেল। টুইডেল গিয়ে পর্দা সরালেন। তারপর ডোরোথি লিখলো—সকলে চুপচাপ বসে থাকো…আমি কথা কইবো।

সকলে চুপচাপ…উৎকর্ণ…হঠাৎ ম্যাজ শুনলেন তাঁর কানে গুঞ্জন-রব! টেবিলের কাপড়টা উড়তে লাগলো… যেন বাতাস লেগেছে! তারপর ম্যাজের কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব এবং মূর্চ্ছায় ম্যাজের দেহ চেয়ারে হেলে পড়লো। সকলে বুঝলেন, স্পিরিটের আবেশ হয়েছে। একটু পরে স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠে ম্যাজ বললেন—জানো, আমি পঁচানব্বই বছর বেঁচেছিলুম! নিজের হাতে কত বেহালা, কত বাঁশী তৈরী করেছি…সবসুদ্ধ ১৮৮৪টা যন্ত্র। আমি কাজ ছাড়া থাকতুম না। বেশ ধীরে ধীরে কাজ করতুম… কখনো তাড়াহুড়ো করিনি, ফাঁকিও দিইনি। স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার…দেহে ছিল শক্তি। তোমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসবার একশো বছর আগে ১৭৩৭ সালে আমি ইহলোক ত্যাগ করেছি। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত…এখন আমি চললুম।

এর পাঁচ মিনিট পরেই ম্যাজ সচেতন হয়ে উঠে বসলেন।

তার পর ১২ই জুলাইয়ের কথা : টুইডেল লিখেছেন—বিছানায় পড়ামাত্র স্ত্রী ম্যাজ গভীর নিদ্রায় অভিভূত

হলেন। আমার চোখে ঘুম নেই…জেগে আছি… অনেকক্ষণ জেগে আছি। তারপর স্ত্রী হঠাৎ বলে উঠলেন—না, না, না। আমি বললুম—কি হয়েছে? ম্যাক্স বললেন… ঘুমের ঘোরে বললেন—আন্ত…আন্ত-আন্তোনিয়াস…স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারছি না। হ্যাঁ, আমি ইংরেজী জানি।

এইটুকু…তার পর ম্যাক্স চুপ…ঘুমোচ্ছেন। পরের দিন তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন—তিনি কিছু জানেন না।

৮ই জুলাইয়ের দিনলিপিতে এক অদ্ভুত কাহিনী লিখেছেন টুইডেল। তিনি লিখেছেন—রাত আটটা…ম্যাক্স এবং ডোরোথি বসেছেন প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে…আমি চেয়ারে বসে আছি। ষ্ট্রাডের স্পিরিটের আবির্ভাব…ষ্ট্রাড লিখলেন—ডয়েলকে (স্যর কোনান ডয়েল…তিনি তখন পরলোকগত) দেখলুম, নদীর ধারে বসে আছেন। ক' ঘণ্টা পরে তিনি কাজ করবেন—He will be active in a few hours. ডোরোথি প্রশ্ন করলে—শীগগির তাহলে? ষ্ট্রাড লিখলেন—হ্যাঁ। পরলোক-তত্ত্বে তাঁর অনুরাগের কথা কে না জানে? এখন এপারে এসেও তাঁর অনুশীলন ত্যাগ করেননি। আমি যাই…তাঁকে এখানে নিয়ে আসবো সামনের বুধবার রাত আটটার সময়।

এবং বুধবার ৯ই জুলাইয়ের দিনলিপিতে টুইডেল লিখেছেন—বেলা বারোটা…ম্যাক্স আর আমি বসেছি প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে। ষ্ট্রাড লিখলেন, আমরা যেন সামনের হপ্তায় ব্রাডফোর্ডে যাই মিষ্টার হোপের কাছে। সেখানে কোনান ডয়েল প্লেটে ছবি দেবেন। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় ম্যাক্স এবং ডোরোথি বসলেন প্ল্যাঞ্চেটে। স্যর কোনান ডয়েলের স্পিরিট-এর

আবির্ভাব হলো। তিনি পরলোকের বার্ত্তা দিলেন— The Paradise Message…এবং ১৪ই তারিখে আমি পেলুম স্যর কোনান ডয়েলের এক আশ্চর্য্য ফটোগ্রাফ। সে-কথা পরে বলবো।

২রা অগষ্ট…১৯৩০। টুইডেল লিখেছেন—হোপ এলেন দুপুর বেলায়…বৈকালে স্পিরিটের ফটো তোলা হলো। সন্ধ্যাবেলায় বড় ওক কাঠের টেবিল ঘিরে আমরা কজনে বসলুম—আমি, আমার স্ত্রী ম্যাজ, আমার ছেলে, তিন মেয়ে এবং মিষ্টার হোপ। হোপের এক বন্ধু এসেছিলেন …তিনিও বসলেন। টেবিলের উপর আমি রাখলুম একখানি কোয়ার্টার-প্লেট স্লাইড…তার মধ্যে আমি নিজের হাতে প্লেট পুরেছিলুম। স্লাইডখানি আমি টোন সুতা দিয়ে বেঁধে তার উপর দস্তুরমতো শীল করে সহি করে দিয়ে-ছিলুম। হোপকে সেটি স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি এবং প্লেটখানি ডেভেলপ হবার আগে পর্য্যন্ত তিনি প্লেটে হাত দেননি।

তার পর আমরা সান্ধ্য-উপাসনা করলুম। উপাসনার পর ঘরের নানা জায়গায় আলোর রশ্মি পড়তে লাগলো… সঞ্চরণশীল আলোর রশ্মি! টেবিলের উপর পড়লো সে-আলো—আমরা তখন থেকে সে-আলোর উপর নজর রাখলুম। একটু পরেই দেখলুম, বিদ্যুতের ঝলকের মতো সে-আলো তীব্র হয়ে উঠলো! টেবিলের মাঝখানে স্লাইড …সে-আলোর ঝলক পড়লো সেই স্লাইডের উপর। তারপর সে-আলো গেল সরে…অদৃশ্য হয়ে। তখন স্লাইড নিয়ে আমি ঢুকলুম ডার্ক-রুমে এবং সেটি ডেভেলপ করলুম।

দেখি, প্লেটে লেখা—My song…'আমার গান'। ষ্ট্রাডের স্পিরিটের হাতের লেখা। এ-ফটোর ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার—হোপ কখনো ষ্ট্রাডের হাতের লেখা দেখেননি! তিনি জানতেন না, তাঁকে বলা হয়নি যে ষ্ট্রাডের স্পিরিট ক' হপ্তা ধরে একটি গান লিখছিলেন—প্লাঞ্চেটের অটো-রাইটিং প্রণালীতে। নেগেটিভে একটিমাত্র স্পষ্ট edge—তার অর্থ, ডবল এক্সপোজারের কোনো লক্ষণ নেই!

১৯০০…১৬ই অক্টোবর তারিখে…রীতিমত শব্দ তুলে ব্রুকের স্পিরিট এসে জানালেন—আমি ব্রুক। আটটার সময় ডয়েল আসবেন! এবং ঐ তারিখ থেকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে কোনান ডয়েলের স্পিরিট আবির্ভূত হয়ে আমাদের নানা প্রাকটিকাল উপদেশ দিয়েছেন।

এর পর কোনান ডয়েলের সঙ্গে টুইডেলদের চক্রে বহু স্পিরিটের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের এক-একজন বিশেষ বাণী লিখেছিলেন। সেগুলি বাস্তবিক প্রণিধানযোগ্য।

বিখ্যাত ইতালীয়ান সুরশিল্পী চোপিন বাণী লিখেছিলেন—Truth is stranger than fiction and will prevail in the end—কল্পনার চেয়ে সত্য বেশী আশ্চর্য্য এবং তার জয় হবেই।

কোনান ডয়েলের বাণী: মানুষের দেহ সম্মান এবং শ্রদ্ধার বস্তু।

জন ল্যামন্ত: যখন পৃথিবীর উপর ভগবানের স্নেহদৃষ্টি পড়ে, তখন সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করে…জাতিতে জাতিতে বিরোধ-দ্বন্দ্ব ঘটে না।

টুইডেলের মাসির বাণী: আমি কফিন আর কবর থেকে বেরিয়ে এসে ভারী আরামে আছি।

শার্ণৎ ব্রেণি: হানাবাড়ী এ-যুগেও আছে বিস্তর। আজ যে নতুন বাড়ী তৈরী হলো, আগামী কাল সে-বাড়ী হবে হানাবাড়ী—এ-বিষয়ে তোমাদের অনেক কথা আমি বলতে পারি।

চার্লস কেনেডি—ভগবান এ-বাড়ীকে শান্তিময় রাখুন।

বৈজ্ঞানিক মর্সে'র বাণী—যে-ধনবান ব্যক্তি প্রকৃত বন্ধুত্ব কামনা করে, সে তার ধন-সম্পদ ভোগ করে সকলের সঙ্গে সকলকে নিয়ে সমান ভাগে।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য লিখেছেন—তাঁর সাইকিক সোসাইটির চক্রবৈঠকে বিবেকানন্দ স্বামিজী অমূল্য বাণী দিয়েছিলেন—প্রেম আর সেবা সব ধর্ম্মের সার কথা। লোকের সেবাই হলো নারায়ণ পূজা। লোককে ভালোবাসাই হলো ভগবানকে ভালোবাসা। ঠাকুর আমাদের ঘণ্টানাড়া সাধু করে যাননি, তিনি ধূপ ধূনার আরতি চাইতেন না…তিনি চাইতেন না পুষ্প-চন্দনের অঞ্জলি। তিনি চাইতেন শুধু প্রাণ। সেই প্রাণ দিতে পারা যায় সেবাব্রত নিলে…সেই প্রাণ দিতে পারা যায় আত্ম-পর ভুলে সকলকে ভালোবাসলে, সকলের সেবা করলে…সকলের সুখে নিজেকে সুখী মনে করলে!

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলার বিষয়ে কয়েকজন স্পিরিট বলেছেন—সাতদিন পরে কি ঘটবে, শুধু এইটুকু বলা যায়। তার বেশী যা বলি, সেটা অনুমান করে। অভিজ্ঞতা থেকে এ-অনুমান আমরা করি। তার কতক মিলতে পারে…কতক মিলবে না।

আট

দেহত্যাগের পরেই—যমদূত—স্বর্গ-নরক

পূর্ব্বে লিখেছি—ষ্টাডের স্পিরিট ৮ই জুলাই জানিয়েছিলেন, কোনান ডয়েলের স্পিরিট আসবেন টুইডেল পরিবারের চক্রবৈঠকে—এ-কথা সত্য হয়েছিল। ৯ই জুলাই তারিখের দিনলিপিতে টুইডেল লিখেছেন—

রাত আটটা···চক্রে বসেছিলেন টুইডেল, তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা ডোরোথি। ষ্টাডের স্পিরিট এসে প্রথমে লিখলেন—কোনান ডয়েল এসেছেন। এসে কোনান ডয়েল লিখলেন—টুইডেল, আমি এসেছি। প্যারাডাইসে আমরা থাকি···সেটা স্বর্গ নয়···ডাম্পিং গ্রাউণ্ড—পারসি ভাষায় যাকে বলে 'বাগ'। Paradise means not heaven···but a dumping place—a park···Persian word. যেখানে আমরা আছি, সেখানকার বর্ণনা আমি মাঝে মাঝে লিখে জানাবো। মৃত্যু নয়, মহানিদ্রা! যখন সে-ঘুম ভাঙলো···আমি বুঝলুম, আমি ভালো আছি···মুক্তি পেয়েছি। সে-অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জেগে উঠতেই প্রথমে দেখা ক্রুকসের সঙ্গে। তুমি পরলোক সম্বন্ধে বই লিখছো···আমি তোমাকে অনেক তথ্য জানাবো। পরলোকে এসে অনেকের অভিনন্দন পেয়েছি···সে-সব কথা পরে লিখে জানাবো। তোমার এখানে ল্যাম্বেথ কনফারেন্স হচ্ছে···চার্চ এসেম্বলি···তার জন্য তোমাকে অনেক পরামর্শ আমি দেবো···বলবার মতো অনেক কথা পাবে আমার কাছ থেকে।

ব্রকের স্পিরিটও এসেছিলেন। তিনি বললেন—স্যর কোনান ডয়েল নিজে থেকে লিখে দেবেন বহু কথা।

ব্রক আরো লিখলেন—(কোনান ডয়েল নদীর ধারে আছেন—এ-কথা জানিয়েছিলেন ষ্ট্রাডের স্পিরিট) সেই নদীর সম্বন্ধে ব্রক লিখেছেন—

I saw a new heaven and a new earth,
And he showed me a pure river of water
of life clear as crystal.
And on either side of the river
Was there the tree of life,
And the leaves of the tree were
For the healing of the nations.

অর্থাৎ—আমি নতুন স্বর্গ দেখেছি···নতুন পৃথিবী দেখেছি। উনি (কোনান ডয়েল) আমাকে দেখালেন জীবন-বারি ভরা নদী···সে-নদীতে জীবন-বারি স্ফটিকের মতো পরিষ্কার স্বচ্ছ। নদীর উভয় তীরে জীবনতরু···তার পাতাগুলোয় সকল জাতির আরোগ্য আর আরাম।

স্পিরিট আরো লিখেছেন—মৃত্যুতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করবার পর আত্মা কিছুদিন অচেতনভাবে থাকে···বিরাম-বিশ্রামে যাতনা-দুঃখ ভোলবার জন্য। নশ্বর দেহে যত দুঃখ-যাতনা ভোগ করে মানুষ, যত উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা ভয়-সংশয়···সে-সব ঝরে যায় এই সময়ে···তার পর হয় আত্মার জাগরণ।

টুইডেল লিখেছেন—স্যর কোনান ডয়েলের স্পিরিট এ-কথা লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের অভিজ্ঞতার কথা বললে ব্যাপারটির মর্ম্ম আরো উপলব্ধি হবে।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর···১৯৪৫, ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে···রাজেন্দ্রলাল তাঁর পারিবারিক চক্রে রবীন্দ্রনাথের স্পিরিটকে আহ্বান করে এনেছিলেন··· মিডিয়ামের মাধ্যমে। অটো-লিখন প্রণালীতে প্রাপ্ত সে-বৈঠকের বিবরণ রাজেন্দ্রলাল তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁর গ্রন্থ থেকে এ-বৈঠকের বিবরণটুকু উদ্ধৃত করে দিলুম :—

প্রশ্ন—আপনি কে ?

উত্তর—আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—আপনার মহাযাত্রার বর্ণনাটি লিখে নিতে চাই।

—বেশ, লিখে নাও।

: আমি যখন কলকাতায় দেহত্যাগ করলুম, তখন দেখলুম যে দেহ থেকে একটা সাদা কুয়াশা যেন বেরিয়ে এলো! দেহ তখনও শয্যার উপর পড়েই ছিল। সেই কুয়াশাটা ক্রমে আমার কাছে এলো···আমি তার ভিতরে প্রবেশ করলুম। তখন দেখতে লাগলুম যে, আমার আত্মীয়-পরিজনেরা আমার সেই দেহটি ঘিরে কাঁদছে। আমি কয়েকবার তাদের বললুম যে, 'ওগো আমি মরিনি। এই তো আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।' তারা আমার কথা শুনলো না···কাঁদতেই লাগলো —তাদের জন্য আমার বড় দুঃখ হতে লাগলো···ভাবলুম,

যাক···আবার দেহটার মধ্যে প্রবেশ করি। চেষ্টা করলুম··· কিন্তু কিছুতেই তা হলো না।

সে-সময় আমার চেহারা ছিল ধোঁয়ার আকার··· যাকে বলে, সূক্ষ্ম শরীব। হাত-পা সবই তখন আমার ছিল···কিন্তু সবই ছিল ধোঁয়ার তৈরি। আমি আমার স্থূল দেহের ভিতর প্রবেশ কবতে না পেরে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। তখন পর্য্যন্ত আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে আমার মৃত্যু হয়েছে! আমি মনে করছি, স্থূল দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছি···বাইরের একটু হাওয়া-বাতাস লাগিয়েই আবার দেহের মধ্যে ফিরে যাবো।

যখন ফেরা গেল না···তখন আমি একটু হতভম্ব হয়ে পড়লুম। চেয়েই দেখি, আমার চারিদিকে কয়েকজন খুব ভদ্রবেশী বাঙ্গালী এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের দুজনের দেহ ছিল জ্যোতির্ম্ময়। আমি তাঁদের চিনতে পারলুম না। যাঁদের জ্যোতির্ম্ময় দেহ ছিল···তাঁরা স্নেহ-মধুর কণ্ঠে হাসতে হাসতে বললেন—কবি, আপনি তো আর বেঁচে নেই। আপনার মৃত্যু হয়েছে।

আমি বললুম—কখন আমার মৃত্যু হলো? এই তো আমি হাওয়া খেতে দেহটা থেকে বেরিয়েছি।

তাঁরা শুনে খুব হাসতে লাগলেন। তখন একজন বললেন—আমাদের সঙ্গে চলে আসুন, কবি। এখানে থেকে আর ফল কি? সত্যই আপনার মৃত্যু হয়েছে।

আমি বললুম—কোথায় নিয়ে যাবেন?

তাঁরা বললেন—চলুন, কোনো ভয় নেই। আপনার জন্য যে-স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে···চলুন সেইখানে।

বললুম—চলুন তবে!

তাঁরা আমাকে ঘিরে নিয়ে ত্বরিতপদে চললেন একটা কুয়াশার ভিতর দিয়ে। আমরা হেঁটে হেঁটে অনেকদূর গেলুম···সেই কুয়াশার ভিতর দিয়ে। দেখছি যে তার শেষ আর হয় না! আমার তখন খুব অবসন্ন মনে হতে লাগলো। আমি বললুম—দেখুন, আমি তো আর চলতে পারছি নে। বড় অবসন্ন লাগছে।

তাঁরা বললেন—আর বেশীদূর এ-কুয়াশা নেই। ঐ দেখুন, সামনেই আলো দেখা যাচ্ছে। কোনোমতে এইটুকু চলুন। দরকার হয় যদি তো আমাদের হাত ধরুন।

আমি তখন তাঁদের একজনের হাত ধরে খুব ধীরে ধীরে চলতে লাগলুম। একটুখানি গিয়েই দেখি, চারদিকে বেশ আলো···যেন চাঁদের আলো···কিংবা তার চেয়েও যেন জোর আলো!

আমি বললুম—আমি তো আর চলতে পারছি নে। এইখানে একটু জিরিয়ে নি। এই বলে সেইখানে বসে পড়লুম এবং পরক্ষণেই শুয়ে পড়লুম সেই মাটির উপর। শুতে শুতেই এমন ঘুম এলো যে আর কিছুমাত্র জানিনে।

কদিন ঘুমিয়েছিলুম, তা বলতে পারি না। একদিন হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখি, আমার পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে সামনে দেখেই আমি ধড়মড় করে উঠে প্রণাম করলুম।

এ-কথার সঙ্গে কোনান ডয়েলের স্পিরিটের কথার মিল দেখতে পাই। তাঁর স্পিরিট বলেছেন—নশ্বর দেহের

জ্বালা-যাতনা উদ্বেগ-সংশয় প্রভৃতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেহ ত্যাগের পর কিছুকাল আত্মা অচেতন অবস্থায় থাকে। রবীন্দ্রনাথের স্পিরিটও ঐ এক কথা বলেচেন।

এক বন্ধুর কথায় বন্ধুর পরলোকগতা মায়েব স্পিরিটকে আনা হয়েছিল। নানা কথার মধ্যে তিনি জানিয়েছিলেন—সংসারের সব কথা ভুলে গিয়েছি। এখানে এসে পৃথিবীর সব কথা ভোলা হলোই কাজ। না ভুলতে পারলে বহু কষ্ট পেতে হয়। মৃত্যুর সময় কোনো কষ্ট হয়নি…মনে হলো, যেন ঘুমিয়ে গেলুম। জেগেই দেখি, একটা নূতন জায়গা। সেখানে অনেক লোক এসে আমাকে নিয়ে গেল।

তাঁর আর এক বন্ধুর পরলোকগতা কন্যার স্পিরিট এসে এমনি কথাই জানিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন—মৃত্যুর কথা মনে নেই। এইটুকু মনে আছে, একদিন ঘুমিয়ে পড়লুম। জেগেই দেখি, তোমরা কেউ কাছে নেই… আমি একটা অজানা জায়গায় এসেছি…সেখানকার কয়েকটি মেয়েছেলে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

আর এক পরলোকগত ব্যক্তির স্পিরিট (১৯০৫, ৯ই সেপ্টেম্বর) জানিয়েছিলেন—নশ্বর দেহত্যাগের পর পরলোকে এসে ঘুম…কতদিন এ-ঘুম, তা জানি না—সাধারণতঃ অল্প সময়ে এ-ঘুম ভাঙে না…ঘুম ভাঙতে পাঁচ-সাত দিন সময় লাগে।

স্বর্গ-নরক—পুণ্য করলে স্বর্গলাভ…পাপ করলে নরক-বাস… এমনি একটা কথা চিরকাল চলে আসছে আমাদের দেশে। এ

সম্বন্ধে নানা দেশের নানা স্পিরিট নানা মত প্রকাশ করেছেন। কোনান ডয়েলের কথাগুলি সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। তাঁর স্পিরিট লিখেছেন—A child is born into a certain environment of religious thought grows up in it and is nearly always influenced by his training. Yet it would not be safe merely on that acount to say that man is a Christian—যে-জাতে যে-পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেই জাতের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সংস্কার তার মনে বদ্ধমূল হয়। তবু ঐ কারণেই এমন কথা বলা চলে না যে, অমুক খৃষ্টান, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ। Man's deeds and life are what count. —এ-কথা আমাদের দেশের স্পিরিটদের লিখনেও পাই। তাঁরাও বলেন—মানুষের কাজ এবং জীবনধারা মানুষের আসল পরিচয়। Love for others makes his journey here more smooth. এ-কথায় বিবেকানন্দ স্বামিজীর কথার প্রতিধ্বনি পাই—There is no hell except what a man makes for himself...no eternal punishment in fire as the Churches threaten. Sins are not forgiven unless the soul concerned is penitent and wishes to do right.

একটি বৈঠকে স্যর কোনান ডয়েলের যে প্লেট-ফটো নেওয়া হয়েছিল, সে-প্লেটে তাঁর নাম-সহি পর্য্যন্ত ছিল। তাঁর পত্নী লেডি ডয়েলকে টুইডেল পাঠিয়েছিলেন নামসহি-করা সেই ফটো। দেখে লেডি ডয়েল পত্র লিখে টুইডেলকে

জানিয়েছিলেন—The writing on the psychic photo is undoubtedly that of Sir Arthur and the signature identical—অর্থাৎ ফটোর লেখা এবং নামসহি হুবহু মেলে স্তর আর্থারের হাতের লেখা এবং সহির সঙ্গে।

স্তর কোনান এই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন—এ ছবি প্রচার করো। বহু অবিশ্বাসী মানুষ আছে, তাদের বিশ্বাস হবে পরলোক-তত্ত্বে এবং তাহলে বিয়োগ-বেদনার ভার অনেকখানি হালকা হবে নরলোকে।

১৯৩২...২৩শে নভেম্বরের দিনলিপিতে টুইডেল এক আশ্চর্য্য কাহিনী লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—আমার অটোমেটিক মেশিনের চাবি হারিয়েছে...খুঁজে পাচ্ছি না। সাইকিক বৈঠকে স্তর কোনান এসে লিখলেন—বাড়ীর সদর দোরে 'ম্যাটের' নীচে তোমার চাবি পড়ে আছে।

এ লেখা দেখে টুইডেল তখনি ছুটে সদরে গেলেন, গিয়ে মাতুরের নীচে চাবি পেলেন।

টুইডেল লিখেছেন—এমন কত জিনিষ হারাতো...চক্রে সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সঠিক সন্ধান মিলতো এবং হারানো জিনিস পেয়েছি প্রত্যেকবার। We have had many such revealings of the bunches of lost articles which alone would be sufficient to prove not only the existence of our spirit communications but also the fact that they can clearly see what we are doing and the objects and scenes of our earthly life completely refuting the absurd

notion, frequently put forth, that a spirit can only see through the eyes of the psychic.

বহু অবিশ্বাসীর ধারণা—টেবল-টার্ণিং-এ বা প্ল্যাঞ্চেটে কিংবা মিডিয়ামের মাধ্যমে স্পিরিটের আবির্ভাব হলে যে-সব জবাব আমরা পাই, সে-সব চক্রবৈঠকে যাঁরা বসেন…তাঁদের কারো মনের কথার প্রতিধ্বনি বা প্রতিলিপি মাত্র। হারানো জিনিষ ফিরে পাওয়ার এ-ব্যাপারে তাঁদের সে-ভুল নিশ্চয় ভাঙবে।

এবারে আর একটি অলৌকিক কাহিনী বলি :—

টুইডেল লিখচেন—১৯৩৬ সাল…২৬শে এপ্রিল…আমার বেশ কঠিন ব্যাধি…ডাক্তাররা, স্পেশালিষ্টরা দেখে বললেন, সাংঘাতিক ব্যাধি…যদি বড় রকম অস্ত্রোপচার করা হয় তাহলে বাঁচলে বাঁচতে পারেন। আমার ছেলের কাছে ডাক্তাররা বলে গেলেন, কোনো আশা নেই…বড় জোর আর দু ঘণ্টা! তাঁরা বললেন, অপারেশন করাবেন? আমরা বললুম, ঘণ্টাখানেক সময় দিন…ভেবে দেখি। তখন তাঁরা ছেলেকে বলেন—দু-ঘণ্টা বড় জোর আর বাঁচবেন।

আমরা তখন চক্রবৈঠকে বসলুম…স্যর কোনান ডয়েলের স্পিরিট এলেন। তিনি বললেন—না…অপারেশন করবেন না। আপনা থেকেই সেরে উঠবে।

অপারেশনে মত দিলুম না। স্যর আর্থারকে দিনে দুবার তিনবার ডাকা হয়…তাঁর স্পিরিট আসেন…তিনি দেখেন…দেখে ব্যবস্থা দেন…তবে বলেন, দশ দিন ভোগ আছে…তার পর সম্পূর্ণ আরোগ্য; এবং হলোও তাই।

১৯৩৬ সালে ১০ই জুলাই তারিখে তাঁর স্পিরিট জানান—শীঘ্র ভীষণ যুদ্ধ বাধবে…বিশ্বযুদ্ধ…সারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র

দারুণ ওলোটপালোট হয়ে যাবে। এ-কথা তিনি জানালেন স্পেনে পেট্রিয়ট ফৌজ নামবার দশ দিন পূর্ব্বে এবং সে-যুদ্ধে যে-ব্যাপার হলো···পৃথিবীর কারো তা অজানা নেই!

১৯৩৬, ১০ই অক্টোবর···টুইডেল লিখেছেন—ফ্লু হয়েছে আমার। সকালে ঘুম ভেঙেছে···বিছানা ছেড়ে উঠবো··· আমার ঘরের মেঝেয় যেন খুব ভারী খিলেন ভেঙে পড়লো··· আমার খাটের কাছে···চার ফুট মাত্র দূরে। তেমনি শব্দ— শুনে চমকে উঠলুম। চেয়ে দেখি, কোথায় কি···মেঝেয় কিছু পড়েনি তো···বুঝলুম, সাইকিক কোনো ব্যাপার।

আমার স্ত্রী এলেন ঘরে···বললেন—আশ্চর্য্য ব্যাপার··· বলতে এলুম।

স্ত্রী বললেন—স্বপ্ন দেখছিলুম···সাণ্ডারলাণ্ডের বিখ্যাত ডাক্তার ব্রুস লো···যিনি আমাদের বাড়ী চিকিৎসা করতেন ···তাঁকে দেখলুম স্বপ্নে। লো বেঁটে মানুষ··তাঁকে দেখলুম স্যর কোনান ডয়েলের পাশে—বড় গাছের পাশে যেন দুর্বাঘাস! আমাকে ডেকে স্যর কোনান ডয়েল বললেন— আয়োডিন আর পোটাসিয়াম ব্যবহার করো। ব্রুস লোও তাতে সায় দিলেন। স্যর আর্থার তার পর আমার মাথায় হাত দিলেন··আমি তাঁর হাতের স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব করলুম। ঘুম ভেঙে গেল···উঠে জানলার পর্দা সরাতে আয়নাতে মুখ দেখলুম—যা দেখলুম···ছুটে তোমাকে বলতে এলুম। বলো তো, আমার মুখে কি?

আলোর সামনে তাঁকে এনে দেখি, তাঁর রগে পাঁচটা আঙুলের দাগ। মানুষের আঙুলের দাগ···ফুলেচে···কালচে-পানা কালশিরা পড়েছে যেন···সাবান-জলে ধুয়ে দাগ গেল·

না। স্ত্রীর ভাবনা হলো, এ-দাগ জন্মের মতো থাকবে না কি?

বৈঠকচক্রে স্যর কোনান ডয়েল জানালেন—রগে তিনিই আঙুল টিপে ও-দাগ করেছেন। আয়োডিন আর পোটাসিয়ামের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন—এ-দাগ দুদিনে মিলিয়ে যাবে।

তাঁর স্পিরিটের সঙ্গে আট বছর ছিল টুইডেল পরিবারের নিত্য যোগ…তার পর স্যর বিদায় নিয়ে যান·· জানিয়ে যান যে, তিনি বিধানবশে উচ্চলোকে যাচ্ছেন—ministered unto…অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন ministering spirit.

এই ministering spirit সম্বন্ধে আমাদের দেশের স্পিরিটরাও অনেক কথা বলেছেন। এবারে সে-কথা বলি :—

রাজেন্দ্রলালকে বহু স্পিরিট জানিয়েছিলেন—নূতন কেউ পরলোকে এলে যতদিন না সব ব্যাপার সে শিখে নিতে পারে, ততদিন তাকে একলা কোথাও যেতে দেওয়া হয় না; time limit কিছু নেই…তবে প্রায়ই তিন-চার মাস সময় লাগে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর গাইড হয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন দুজন দেবদূত। রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন—কাহারও মৃত্যুর পরই যদি কোনো শক্তিসম্পন্ন পুরুষ তাঁহাকে লইয়া যান, তাহা হইলে সেই নবীন যাত্রীকে সেই শক্তিমান পুরুষ প্রেতলোক ছাড়াইয়া আরও উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারেন বলিয়া কোনো কোনো আত্মিক বলিয়াছেন। ইহা অবশ্য সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

রাজেন্দ্রলাল আরো বলেছেন—কখনো কখনো এরূপ দেখা

যায় যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ভয়-বিজড়িত কণ্ঠে বলিতেছে—ঐ, ঐ আসিল···আমাকে ধরিতে আসিল। এইরূপ চীৎকার শুনিলেই সর্ব্বপ্রথমে আমরা মনে করি, ও কিছু নয়···প্রলাপ মাত্র। সুবিধা থাকিলে তখনই রোগীর শিয়রে একটার স্থানে দুইটা আইস-ব্যাগ ধরি এবং মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য ডাক্তারের নিকট ঔষধ চাহি। এখন আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি যে একদিন যমদূত, বিষ্ণুদূত, শিবদূত প্রভৃতি দূতগণের কথা আমাদের দেশে সর্ব্বদাই বলা হইত। পরলোকের নিয়মই এই যে পৃথিবীতে যে যেমন চরিত্রের লোক ছিল, ওপারে যাইয়া তাহাকে সেইরূপ চরিত্রের লোকের সহিতই বাস করিতে হয়। তথায় আত্মোন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধলোকে গমন করিবার অধিকার হয় না। যোগ্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্যই তাই সেই স্থানের দূতগণ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই আসিয়া শিয়রে দণ্ডায়মান থাকেন।

আমার এক আত্মীয়ার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কাহিনী ছেলেবেলায় শুনেছিলুম। তিনিও এ-কাহিনী সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন।

কলিকাতায় ভবানীপুরের মুখুয্যেরা বহু প্রাচীন বোনেদী ঘর···আমার দিদিমা সেই মুখুয্যে বাড়ীর কন্যা। তাঁর এক পিসিমা···তখন তাঁর বয়স পাঁচ-ছ বছর···বাড়ীতে সেই পিসিমার মা অন্তিমশয্যায়···রাত দশটা কাটে কি না! কবিরাজ ফতোয়া দিয়ে গিয়েছেন···সন্ধ্যার সময় বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ধরে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে···পিসিমাকে কোনো রকমে তাঁর মায়ের বিছানার পাশ থেকে টেনে এনে খাওয়ানো

হয়েছে। খাওয়ার পর তিনি ধুপধুপ শব্দে ছুটে চলেছেন দোতলায় মায়ের ঘরে···সেকালের বাড়ীর ঘোরানো সিঁড়ি··· সেই সিঁড়ির সব উপর ধাপে উঠেছেন···হঠাৎ দেখেন, সিঁড়ির সামনে জোয়ান ষণ্ডা চেহারার কজন মানুষ—যেন দুর্গা ঠাকুরের অসুর! তিনি ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাচ্ছিলেন···পিছনে কে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল···তাঁকে ধরে ফেললো। তার এক ঘণ্টা পরে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়।

তাঁর মুখে ঐ চেহারার কথা শুনে সকলে কাঁটা! কোনো মানুষ অন্দরে দোতলায় আসে না, বা আসতে পারে না।

অনেকে বললেন, যমদূত!

এর প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে···এই পিসিমা কলকাতায় ···তাঁর জা এবং দ্যাওর থাকতেন চুঁচড়োয়···দ্যাওরের খুব অসুখ। পিসিমা তাঁর বয়স্ক ছেলেকে নিয়ে চুঁচড়োয় গেলেন দ্যাওরকে দেখতে। কথা ছিল, তাঁকে রেখে ছেলে চলে আসবে। কিন্তু পিসিমা ষ্টেশন থেকে ভাড়া-গাড়ীতে করে দ্যাওরের বাড়ীর ফটকে নামবেন···দেখেন, ফটকে কজন ষণ্ডাপানা মানুষ···ছায়ামূর্ত্তি! দেখে তিনি ছেলেকে বললেন— তুই চলে যাসনে রে···গতিক আমি ভালো বুঝচি না।

ছেলে বললেন—কি করে বললে···কাকাকে দ্যাখোনি এখনো!

মা বললেন—তবু বুঝেচি। পরে বলবো।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় দ্যাওর মারা গেলেন। পিসিমা বলতেন—বাড়ীতে কেউ মারা যাবেই···এমন বহু ক্ষেত্রে তিনি এমন ছায়া-শরীর দেখেছেন।

স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে বিদেশী স্পিরিটের কথা আমরা পূর্ব্বে বলেছি। আমাদের দেশের স্পিরিটদের এ সম্বন্ধে বক্তব্য রাজেন্দ্রলাল যা লিখেছেন, তা এই :—তপ্ত তৈলকটাহ, কি হেঁটমুণ্ডে অবস্থান প্রভৃতি নরকের যে-সব ভয়াবহ বর্ণনা আছে, ওগুলো কাল্পনিক। যা দেখছি…তাতে এই মনে হয় যে একটি অন্ধকার স্থান…সেখানে ভীষণ শীত…তাই হলো নরক। আর একজন সাধুর স্পিরিট বলেছেন—পৃথিবীর সকল অধঃস্তর পার হয়ে যেখানে পৌছুনো যায়…সেই হলো নরক। সেখানে বায়ু নেই, তাপ নেই, আলো নেই। ইংরেজ জজ এডমণ্ডের স্পিরিট বলেছেন—নরক আনন্দশূন্য। নরকের কষ্ট দৈহিক বা শারীরিক নয়। উহা নিদারুণ মানসিক কষ্ট।

স্পিরিটরা সকলেই প্রায় একবাক্যে বলেছেন—পরলোক আনন্দময়।

পূর্ব্বে বলেছি, পরলোকগত ব্যক্তির স্পিরিট অনেক সময় ভবিষ্যৎবাণী করেন…সে-সব বাণীর কতক ফলে, কতক বা ফলে না। এবং এ-ভবিষ্যৎবাণী তাঁরা করেন, ভূয়োদর্শন জনিত চিন্তা-শক্তির প্রাখর্য্যবশে। বিদেশে এবং এদেশে এমন বহু ভবিষ্যৎবাণীর আশ্চর্য্য সার্থকতা দেখা গিয়েছে। রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন—বিগত দুর্ভিক্ষের সাত-আট মাস আগে থেকে তাঁদের সাইকিক আসরে বিবেকানন্দ স্বামিজী, দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পিরিট আগেই জানিয়েছিলেন—দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হবে…সকলে বেশ সাবধান হও!

নয়

মৃত পশুপক্ষী

অনেকের মনে কৌতূহল হবে, প্রাণী মাত্রেই এক-বিধির অধীন! মানুষ মরে গেলে যেমন তার আত্মা পরলোকে যায়, কুকুর বেড়াল গরু মোষ পাখী···এদেরও আত্মা আছে···এরা মরে গেলে এদের আত্মার কি গতি হয়?

এ-সম্বন্ধে প্রেততত্ত্বানুশীলনীদের গবেষণা-অনুশীলন বড় অল্প নয়। তাঁরা বলেন—এদের আত্মা পরলোকে যায়··· সেখানে এদেরো আত্মার বিশিষ্ট স্থান আছে নির্দ্দিষ্ট এবং এরাও ছায়াদেহে মাঝে মাঝে নরলোকে আসে। এদের সে-ছায়ামূর্ত্তি আমরা দেখি···এদের আত্মার সান্নিধ্য আমরা বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করি।

টুইডেল এ সম্বন্ধে বহু অনুশীলন করেছেন। তিনি লিখে-ছেন তাঁর ১৯০৫ সালের ১৩ই অগষ্ট তারিখের দিনলিপিতে —আমার মাসি লিয়া কোটসের পরলোকপ্রাপ্তি হয়েছে। তাঁর একটি টেরিয়ার কুকুর ছিল···সেটিকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। তাঁর মৃত্যুর ক'বছর আগে কুকুরটি মারা যায়। ১৯১০ সালে ওয়েষ্টন ভিকারেজে হামেশা আমরা লিয়ার ছায়ামূর্ত্তি দেখতুম এবং যখনি দেখতুম··দেখতুম, সঙ্গে আছে তাঁর সেই পোষা টেরিয়ার!

তার পর ১৯১০ সালে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে···আমার মায়ের নাম ধরে অলক্ষ্য আহ্বান শুনতুম। আমার মা তখন বেঁচে। এবং ঐ ডাকের সঙ্গে সঙ্গে শুনতুম অদৃশ্য কুকুরের ডাক···আর শোবার ঘরের দরজায় কুকুরের পায়ের

আঁচড়ানির শব্দ। আমাদের বাড়ীতে কুকুর ছিল না মোটে।

১৯১০, ১৮ই ডিসেম্বর…খাবার ঘরে আমার মা, আমি এবং কন্যা সিনাডিয়া বসে আছি…হঠাৎ ঘরের দরজায় মাসি লিয়ার ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব…সেই সঙ্গে কুকুরের ডাক। সে-ডাক শুনে মা আর সিনাডিয়া গেলেন ঘর থেকে বেরিয়ে… ছায়ামূর্ত্তি তখন মিলিয়ে অদৃশ্য হয়েছে! ওঁরা সিঁড়িতে গেলেন…সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবেন…কে হাত ধরলো মার—সঙ্গে আরো কজন ছিল…সকলে বুঝলেন, মা বাধা পেয়েছেন! মা সিঁড়িতে উঠবেন…কিন্তু পারলেন না… কে যেন তাঁর হাত চেপে ধরে আছে, উঠতে দেবে না! সকলে এটুকু বেশ লক্ষ্য করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের ভেউ-ভেউ ডাক…অথচ চোখে কেউ কুকুর দেখতে পাচ্ছেন না!

এর পর ১৮ই জানুয়ারি তারিখে…মা এসে বললেন—ও-ঘরে কাবোর্ডের নীচে তিনি এবং আমার স্ত্রী দুজনে এইমাত্র দেখেছেন একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আমি গেলুম…তখন বিকেল চারটে…গিয়ে দেখি, তাই। আমার চোখের সামনে কুকুরটা নিমেষে গেল বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে!

বেলা পাঁচটায় আমার তিন মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বললে—দোতলায় শোবার ঘরে একটা সাদা কুকুর! তাড়া দিতে খাটের নীচে গিয়ে ঢুকেছে…কুকুরটা ডাকছে ভেউ-ভেউ-ভেউ-ভেউ! সাড়ে পাঁচটায় বাড়ীর বেয়ারা এসে বললে—মায়ের ঘরে একটা সাদা কুকুর গিয়ে ঢুকেছে কোথা থেকে এসে!

এই সাদা কুকুর এবং মাসি লিয়ার মূর্ত্তি আমরা নিত্য দেখতে লাগলুম।

তিনি আরো লিখেছেন—১৯৩২ সালের মার্চ মাসে... বাড়ীতে হঠাৎ একটা বিড়ালের আবির্ভাব! গায়ে ডোরা কাটা। ন বছর আগে এ-বিড়াল আমরা পুষেছিলুম ...সকলের ভারী আদরের ছিল...তার পর হঠাৎ সে নিখোঁজ হয়। যেদিন নিখোঁজ হয়, সেদিন ছিল খুব বাদলা এবং কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছে। ঘর, বাগান...সর্ব্বত্র বহু সন্ধান করেও বিড়ালের পাত্তা পাইনি আমরা। ভাবলুম, কেউ নিয়ে গেছে...নাহয় বেঘোরে মারা পড়েছে। তার কদিন পরে বাগানের ভিতর দিয়ে আসছি, একটা বাদাম গাছের তলায় দেখি, সেই বিড়াল! তার নাম উইলি... দেখি, পা ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে। জলে ভিজে ঠাণ্ডায় মারা গিয়েছে। আমরা তাকে বাগানে কবর দিলুম...কবরে ফলক লিখে বসালুম...তাতে লেখা রইলো—আদরের উইলি! তার পর দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়...উইলি আমাদের মনের স্মৃতির অতল গহনে কোথায় তলিয়ে হারিয়ে গেল!

এ-ঘটনার এক বছর পরে...দিনের বেলা...আমি চার্চ থেকে ফিরছি...বাগানে সেই বাদামতলা দিয়ে আসছি... আমার মেয়ে ডোরোথি রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো, এসে আমাকে বললে—আমাদের উইলি...দেখবে এসো...ঐ ওখানে প্যাসেজে। আমি গিয়ে দেখি, উইলিই...চুপ করে বসে আছে! অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাব। আমি ডাকলুম—উইলি! আমার ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো উইলির মূর্ত্তি!

এই প্রসঙ্গে টুইডেল লিখেছেন—মৃত্যুর পরেও ইতর প্রাণীদের বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, স্নেহ-ভালোবাসার বহু পরিচয় আমরা পেয়েছি সাইকিক আসরে। তাদের যুক্তির প্রাখর্য্য দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি, বিহ্বল হয়েছি!

১৯৩৫ সালের অগষ্ট সংখ্যা Psychic পত্রিকায় সীজার দ্য ডেমি একটি কেস-এর কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—একটি কুকুর ছিল…খুব আদরের কুকুর…তার নাম ছিল হাচিগো। কুকুরের মালিক জাপানী ডক্টর মেনো। (বিশেষ তারিখে ডক্টর মেনো বাহিরে যেতেন হাসপাতালে রোগী দেখতে—হাচিগো ষ্টেশনে এসে তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিত—তারপর ডক্টর যে-তারিখে ফিরতেন, হাচিগো ষ্টেশনে আসতো। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। তারিখ সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার করা হতো না। সে নিজে থেকে যেতো! তারপর ডক্টর মারা যান—কুকুর ছিল বেঁচে—ঐ বিশেষ তারিখে অর্থাৎ মনিব যে তারিখে ফিরতেন) কুকুর আসতো ষ্টেশনে মনিবকে সম্বর্দ্ধনা করে বাড়ী নিয়ে যাবে বলে। ডক্টর মেনো মারা গেছেন এগারো বছর আগে…তার পর দশ বছর ধরে সেই বিশেষ তারিখটিতে হাচিগো নিয়মিত এসে দাঁড়াতো ষ্টেশনে মনিবের প্রত্যাশায়। ট্রেণ চলে যেতো…হাচিগো দাঁড়িয়ে থাকতো ট্রেণের দিকে চেয়ে—ট্রেণ অদৃশ্য হলে সে বাড়ী ফিরে আসতো। হাচিগো মারা যাবার পর জাপানীরা তার কবরে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে দিয়েছে।

বিখ্যাত লেখক সীজার দ্য ডেমি আর একটি কুকুরের কাহিনী লিখেছেন। সত্য কাহিনী বলে তিনি গ্যারান্টি

দিয়েছেন। এ-কুকুরটি তার মনিবকে খুঁজতে বেরিয়েছিল শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এবং মনিবকে সে খুঁজে বাড়ী নিয়ে এসেছিল।

ইংরেজের কুসংস্কার আছে যে, কালো বিড়াল কুলক্ষণ, অপয়া। কিন্তু টুইডেল বলেন—বাজে কথা। তিনি একটি কালো বিড়ালের কথা জানিয়েছেন—এক মহিলা হঠাৎ একদিন ঘরে কালো বিড়াল দেখে চমকে উঠেছিলেন। পরে তিনি দেখলেন, সে এনেছিল তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ —ভাই ফ্রন্টে মারা গিয়েছেন, এই সংবাদ।

লিয়ার যে কুকুরের কথা টুইডেল লিখেছেন…১৯১৫ সালের অগষ্ট মাসেও তাকে তাঁরা দেখেছিলেন। সেদিন তাঁর স্ত্রী আসছিলেন হল থেকে প্যাশেজ দিয়ে…তাঁর হাতে কাঠের একটি টুল…ঐ টুলটিতে লিয়া বসতেন, তিনি যখন বেঁচে-ছিলেন। হঠাৎ লিয়ার ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব…ছায়ামূর্ত্তি কেড়ে নিলে টুল মিসেস টুইডেলের হাত থেকে ছিনিয়ে…সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তির কণ্ঠে ফুটলো ভাষা—এ তো লিয়ার টুল…আমার টুল…তুমি কেন নেবে! এ-কথা বলে মূর্ত্তি হলো অদৃশ্য… টুল সমেত এবং তাঁর ছায়ামূর্ত্তির পিছনে তাঁর সেই কুকুরের ছায়ামূর্ত্তি!

১৯১৫ সালের ৩০শে মার্চ তারিখের দিনলিপিতে টুইডেল লিখেছেন—প্রতিবেশী বার্ণেট…তাঁর ছিল প্রকাণ্ড এক কুকুর (mastiff)…সে-কুকুর মরে গিয়েছিল। একদিন টুইডেলের পোষা বিড়াল উইলি ভয় পেয়ে ছুটে তাঁর কাছে এলো। টুইডেল চেয়ে দেখেন, তার পিছনে প্রকাণ্ড কুকুর—ছায়াশরীর…চিনলেন, বার্ণেটের সেই কুকুর…যে-কুকুর

মরে গিয়েছে! উইলি ভয়ে কোথায় পালাবে, পথ পায় না! কুকুরটা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ভৌ-ভৌ করে খানিক ডাকলো···তার পর ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বিড়ালও যে ও-ছায়ামূর্ত্তি দেখেছিল···এ-থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ-বিষয়ে আলোচনা করে টুইডেল একটি পরম সত্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—জীবিত নরলোকে ঘোড়া গরু বিড়াল কুকুর···এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যদি দোষের না হয়, এ-সম্পর্কে প্রীতি মায়া ভক্তি স্নেহ যদি অটুট থাকে··· তাহলে মৃত্যুর পর তারা হেয় হবে কেন—বুঝতে পারি না? নিষ্ঠাবান পাদরীরা মৃত পশু-পক্ষীকে যে অবজ্ঞার চোখে দেখেন, তা শুধু নিন্দনীয় নয়···গর্হিত! প্রাণীমাত্রই যদি বিধাতার সৃষ্টি···তাহলে একটা হবে তাঁর খাশ আদরের ···অপরটা হবে অস্পৃশ্য—এর কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। বিড়ালের গায়ের রং কালো হলে কেন সে হবে অপয়া— এরও কোনো অর্থ বা যুক্তি নেই, থাকতে পারে না।

দশ

স্পিরিটের ভবিষ্যৎবাণী—অটো-রাইটিং

এখন আবার স্পিরিটের ভবিষ্যৎবাণীর কটি আশ্চর্য্য কাহিনী বলছি—১৯১৩ সালের ১৫ই এবং ১৬ই অগষ্ট তারিখে ষ্ট্রাডের স্পিরিট কটি কথা লিখেছেন···ম্যাজের চক্রে ভবিষ্যৎবাণী। সে-বছর ইংলণ্ড-স্কটলাণ্ডের এরোপ্লেন-রেস হবার তারিখ নির্দ্দিষ্ট···অগষ্ট মাসে। বেলা ৮টায় ম্যাজের ঘুম ভাঙলো—সেদিন ১৬ তারিখ। ডাকে চিঠিপত্র এলো···

টুইডেল চিঠিপত্র খুলবেন···ম্যাজ বললেন—কাল রাত্রে এরোপ্লেন-রেসের কি ফল হবে, তার সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখেছি।

ম্যাজ বললেন—স্বপ্ন দেখেছি, তিনখানা প্লেন ঘর্ঘর শব্দে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল···দুখানা উড়ে চললো··· একখানার কি যে হলো, দেখা গেল না। তবে তিনি দেখলেন, দুজন লোকের বেশ চোট-জখম···তাদের প্রাণহীন দেহ মাঠে পড়ে আছে।

এ-কথা শুনে টুইডেল বললেন—কিন্তু দুখানা মেশিন উড়েছিল? না···

স্ত্রী বললেন—না···আমি দেখেছি তিনখানা।

এ-কথার পর টুইডেল মোড়ক ছিঁড়ে খবরের কাগজ খুলে তাতে চোখ দিলেন···খবরের কাগজে দেখলেন, পাইলটদের ছবি বেরিয়েছে। ব্রেকফাষ্ট সেরে টুইডেল তাঁর স্ত্রীর স্বপ্নের কথা লিখে পাঠালেন লণ্ডনের 'লাইট' পত্রিকার সম্পাদককে—এ হলো ১৬ই অগষ্ট তারিখের কথা।

সোমবার ১৮ই তারিখে ডেলি মেল পত্রিকায় প্লেন-রেসে দুর্ঘটনার কথা ছেপে বেরুলো। খবর বেরিয়েছে—একখানা প্লেনের পাইলট হুকার ২৪০ মাইল উড়ে যাবার পর এঞ্জিনে গোলযোগ ঘটে। প্রচুর ধোঁয়া বেরুতে থাকে···সে-ধোঁয়ায় হুকার অবসন্ন হন···তখন আর একজন পাইলট সে-প্লেন চালাতে বসেন। কিন্তু এ-পাইলট···এঁর নাম পিক্‌ল্‌স·· চালাতে চালাতে সমুদ্রের বুকে ঝড়ের দোলায় প্লেন ঠিক কায়দায় রাখতে পারেননি। এ ছিল ট্রায়াল-রেস— প্রতিযোগিতার তারিখ ২৭শে অগষ্ট।

সেদিনকার খবর—আয়ার্লাণ্ডের সমুদ্রের ধারে একখানা প্লেন পড়ে চুরমার হয়…২৭শে অগষ্ট, বেলা ১-১৫টায় এবং তার ফলে দুজন মারা গিয়েছেন।

এ-ব্যাপার ঘটবার আগেই 'লাইট' পত্রিকায় ম্যাঙ্গের স্বপ্ন-কাহিনী ছেপে বেরিয়েছিল। টুইডেল লিখেছেন—They can forecast the future sometimes with awe-inspiring accuracy. ষ্ট্রাডের স্পিরিট ব'রবার বলেছেন—সঠিক তারিখ বা ক্ষণ আমরা বলতে পারি না…তবে আসন্ন ঘটনা আভাসে জানতে পারি। টুইডেল বলেন—কখনো কখনো সঠিক তারিখ এবং ক্ষণও তাঁরা বলতে পারেন… সে-পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি।

১৯৩১, ৬ই মার্চ, শুক্রবার। টুইডেল লিখেছেন তাঁর দিনলিপিতে—ষ্ট্রাডের স্পিরিট এসে বলেছেন: সামনের মাসে দুটো বড় ভূমিকম্প হবে এবং দুখানা বড় জাহাজ জলে ডুববে। ৭ই মার্চ তারিখে এ-কথা আমি লিখে পাঠালুম—অবজার্ভার পত্রিকার সম্পাদককে ছাপাবার জন্য। এ-খবর ছাপা হলো…খবরের নীচে সম্পাদকের নোট ছাপা হয়েছিল:—

The Editor received a letter from Mr Tweedale saying that there would be two earthquakes and two shipwrecks this month. On March 12th we received a further letter saying that the second wreck would be of a steamer with two funnels.

এর পর ৯ই মার্চ তারিখের ডেলিগেট পত্রিকায় খবর

ছেপে বেরুলো—যুগোশ্লাভিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে··· ৯৫০ জন লোক মারা গিয়েছে এবং এক হাজারের উপর বাড়ী-ঘর ধ্বংস হয়েছে। দ্বিতীয় খবর বেরিয়েছে—হাম্বারেটার্ণ ষ্টীমার ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে জলে ডুবেছে··· ষোলজন লোক মারা গিয়েছে। এবং এর পর ২৩শে মার্চ ডেলি মেল পত্রিকায় খবর ছেপে বেরুলো—ফার্থ অফ ক্লাইড-এ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে মণ্টক্লেয়ার জাহাজ ভেঙ্গে জলমগ্ন হয়েছে। জলে-ডোবা জাহাজের ছবিও বেরিয়েছিল ডেলি মেল পত্রে এবং ৩১শে মার্চ তারিখে খবর বেরুলো—নিকারাগুয়ার প্রধান শহর মানাগুয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে বহু লোক মারা গিয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ষ্ট্রাডের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলেছিল।

১৯৩০ সালের ২রা নভেম্বর তারিখের দিনলিপি—রাত্রে ম্যাজের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ম্যাজ বললেন—স্বপ্নে শুনলুম···ষ্ট্রাড বললেন, বাড়ীতে আগুন লাগবে···আমরা যেন সাবধানে থাকি।

এ-কথার অর্থ আমরা দুজনে বুঝলুম না।

তারপর ১৭ই নভেম্বর—ম্যাজের আবার ঘুম ভাঙলো রাত্রে। ম্যাজ বললেন—আবার সেই কথা, বাড়ীতে আগুন লাগবে—সাবধান। স্থির হলো, ষ্ট্রাডকে আনিয়ে এর অর্থ বুঝতে হবে।

১৮ই নভেম্বর—রাত্রি এগারোটা···বড় একটা ল্যাম্প··· তার মধ্যে এক কোয়ার্ট তেল···ল্যাম্পটা জেলে বসেছি···সেটা বসিয়েছি একটা হীটিং ষ্টোভের ফ্রেমে···ফ্রেমে সেটা ঠিক

বসেনি···আমার তখন ফ্লু···আলস্যবশতঃ সেটা ভালো করে বসাইনি। তারপর সেটা ধরে তুলে আর এক জায়গায় রাখবো, হঠাৎ ল্যাম্পটা উলটে পড়লো···ঐ ফ্রেমের মধ্যেই পড়লো। যেমন পড়া, তেল উছলে পড়লো ঘরের মেঝেয়। আমি চীৎকার করে উঠলুম···ম্যাজ এলেন ছুটে এবং তেলটা জ্বলবে-জ্বলবে করছে···ম্যাজ এসে মোটা কম্বল চাপা দিয়ে আলো নিবিয়ে ফেললেন। চকিতে এ-ব্যাপার ঘটে গেল। কাজেই দেখছি, এ-ক্ষেত্রেও স্পিরিটের কথা সত্য হলো!

১৯৩১, ১২ই এপ্রিল। বৈকালে ম্যাজ এবং ডোরোথি বসেছিল চক্রে প্লাঞ্চেট নিয়ে···ষ্ট্রাডের স্পিরিট নানা কথার মধ্যে ভবিষ্যৎবাণী লিখেছিলেন—এক মাসের মধ্যে নামজাদা একজন পার্লামেণ্টের মেম্বার মারা যাবেন। দিনের হিসাব করে লিখেছিলেন—আজ থেকে একত্রিশ দিনের মধ্যে। এ-খবর খবরের কাগজে তখনি লিখে পাঠানো হয়েছিল এবং সে-খবর কাগজে ছেপে বেরিয়েছিল।

এ-সংবাদ সত্য হলো। ১২ই মে তারিখে ব্রিষ্টলের মেম্বার রো ন্ড রীশ অসুস্থ হন হঠাৎ···এবং ১৩ই মে তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্পেনের বিদ্রোহের সম্বন্ধেও এমনি ভবিষ্যৎবাণী লিখেছিলেন চোপিন। তিনি লিখেছিলেন—স্পেনের রাজা-রাণী, তাঁদের পরিবারবর্গকে রাজ্য ছেড়ে পালাতে হবে এবং পথে ওঁদের খুড়ী ইনফাণ্টা ইসাবেলা মারা যাবেন। চোপিন এ-বাণী ছন্দে লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

I know Spain and this I know
That its king was forced to go

But ere summer sun sinks low
His people will wish it had not been so.

এ-খবর ঐ কবিতাব ছত্রগুলি সমেত তিন-তিনখানি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল এবং স্পেনের এ-ব্যাপার ঘটেছিল ক' মাস পরে। গ্রীষ্মকালেই…সূর্য্য অস্ত যাবার পূর্ব্বে …লুঠপাট, অগ্নিকাণ্ড, দাঙ্গা-হাঙ্গামা রীতিমত বিপ্লবের উৎপাত হয়েছিল।

বিগত মহাযুদ্ধের সম্বন্ধে স্যর কোনান ডয়েল লিখে-ছিলেন…১৯৩৬ সালে তিনি লিখেছিলেন—এ-বছর অগষ্ট মাসে যুদ্ধ বাধবে…সারা পৃথিবী সে যুদ্ধে টলমল করবে। এ-যুদ্ধে জড়িত হবে জার্ম্মানি, ইতালী আর ফ্রান্স। ইতালী এবং জার্ম্মানি হবে একজোট…অষ্ট্রিয়াও যোগ দেবে জার্ম্মানির পক্ষে।

টুইডেল বলেন—অনেক সময় এমন হয়েছে, চক্রে বসিনি…স্পিরিট নামাইনি—স্বপ্নে আমাদের অন্তরঙ্গ স্পিরিট জানিয়েছেন…ভবিষ্যতের বহু ঘটনার আভাস-ইঙ্গিত।

এ-কথা অবিশ্বাস করার কারণ থাকতে পারে না। তার কারণ, তাঁর স্বপ্নে পাওয়া এমন ঘটনা পরে সত্যই ঘটেছে। তাছাড়া আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে এমন স্বপ্নের কথা চলিত আছে। স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাওয়া, মাদুলি বা ঔষধ পাওয়া—আজো এমন ঘটনা আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ করছি এবং করি।

এমন কয়েকটি স্বপ্ন-কাহিনী বলি :—

টুইডেল স্বপ্ন দেখলেন ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩১। দেখলেন, ওঁরা যেন ওয়েষ্টন ত্যাগ করে চলেছেন—যে-জায়গায় যাচ্ছেন,

স্বপ্নে সে-জায়গাও দেখলেন। সেখানে তাঁরা এলেন একখানি দোতলা বাড়ীতে—বাড়ীটি আধুনিক ছাঁদে তৈরী…বেশী পুরানো নয়…বাড়ীতে এসে মালপত্র গুছোতে সকলে ব্যস্ত। বাড়ীতে তিনটি চাকর। টুইডেল ভাবছেন, তাইতো… এদের মাহিনা দেবে কে? এ-বাড়ীর জন্য রাখা হয়েছে আগে থেকে…তিনি এমন কথা মনে করলেন। এ মনে করা চলেছে স্বপ্নে।

পরের দিন সকালে…তিনি এ-স্বপ্নের কথা তাঁর স্ত্রী ম্যাজকে এবং কন্যা ডোরোথিকে বলেননি…অথচ সেইদিনই বৈকালে প্লাঞ্চেট-চক্রে চোপিন-স্পিরিটের আবির্ভাব! তাঁকে টুইডেল করলেন প্রশ্ন—আমাদের কি ওয়েষ্টন ত্যাগ করে যেতে হবে? জবাবে মিললো ক-ছত্র কবিতা। সে-কবিতা—

Something pleasant……
All at Weston shall wish to
stay no more
In the old place by the river shere.

অর্থাৎ নদীর ধারে পুরোনো জায়গায় কেউ আর থাকতে চাইবে না।

: কোথায় যাওয়া হবে? জবাবে আবার কছত্র কবিতা—

A house with a garden all blooming gay
Will be offered to you one fine day.
And then you will say
Let us hasten away to our own place
to stay.

অর্থাৎ চমৎকার বাগান সমেত একটি বাড়ী দেওয়া হবে একদিন···তখন তোমরা বলবে—চলো, আমাদের ঐ নিজেদের বাড়ীতে থাকি গিয়ে।

এবং এ স্বপ্ন সত্য-সফল হয়েছিল এক বছর পরে।

এখন এই অটো-রাইটিংয়ের প্রবর্ত্তন হলো কি করে··· বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি।

প্রায় একশো বছর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিখ্যাত পরলোক-তত্ত্ববিদ ডব্লু ষ্টেনটন প্লাঞ্চেটের সাফল্য দেখে অটো-রাইটিং-এর প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর এ-পদ্ধতি দেখে পরে অটো-রাইটিং প্রসার লাভ করে। এ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার তরফ থেকে যে সাইকিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সোসাইটির নৈষ্ঠিক সদস্য মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁর পরলোকের কথায় লিখেছেন: চক্রে লিখন-কালে (auto-writing) তাঁর পিতা হেমন্তকান্তি (ইনি auto-writing-এ খুব সাফল্য লাভ করেছিলেন) কোনো মুক্তাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হয়েছেন···এমন কখনো উপলব্ধি করতেন না। এইরূপ লেখাই বোধ হয় conscious auto-writing. Review of Reviews পত্রিকার সুধী সম্পাদক ষ্টেড সাহেব পরলোকতত্ত্বের অনুশীলন করতেন। তিনি auto-writing সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছেন। তবে এ-যুগে যাঁরা auto-writing করেন, তাঁরা বলেন—সম্পূর্ণ অজানা এবং অভাবনীয় বিষয়ে লেখা পাই···সে-লেখা চক্রের যাঁর হাতের লেখায় সম্পাদিত হচ্ছে, যেসব কথা লেখা হয়···সে সম্বন্ধে তিনি মনে-জ্ঞানে কোনো চিন্তা করেন না। তাঁর আঙুলে-ধরা

পেন্সিল শুধু লেখে…যে-লেখার সঙ্গে তাঁর মনের কোনো যোগ নেই। লেখবার সময় মন সচেতন থাকে সত্য, কিন্তু সে সচেতন মন থাকে লেখার সময় সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়। কাজেই এ-ব্যাপারে গোঁজামিল আছে বলে সন্দেহ করবার কোনো হেতু থাকতে পারে না।

এগারো

প্রেতাত্মার দর্শন

ছায়ামূর্ত্তি দেখার কথা আমরা শুনি—এ সম্বন্ধে আমার নিজের যেটুকু অভিজ্ঞতা…আগে বলি।

তখন আমার কিশোর বয়স। সোনাখালি গ্রাম… রেলে কাঁচড়াপাড়া লাইনে মদনপুর ষ্টেশন…সেই ষ্টেশনে নেমে পূর্ব্বদিকে মাঠ ভেঙে জলা ভেঙে তিন-চার ক্রোশ যাবার পর গ্রাম। ১৮৯৯ সালে সেখানে গিয়েছিলুম… পাঁচ-সাতদিন ছিলুম। আমার খুব নিকট আত্মীয়ের বাড়ী… গিয়েছিলুম বিয়ের নেমন্তন্ন। সেবারে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছি…লম্বা ছুটি…কাজেই বেশ হালকা মন নিয়েই গিয়েছিলুম।

সেখানে সমবয়সী সঙ্গী পেলুম…অনেকেই নিমন্ত্রণে এসেছেন। সেকাল…তায় পয়সাওয়ালা প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়…তাঁরা থাকেন পশ্চিমে…দেশের বাড়ীতে এসেছেন মেয়ের বিবাহ দিতে। পাত্র কলকাতার ছেলে…তাঁরাও পয়সাওয়ালা মানুষ। তাঁরা সোনাখালি আসবেন বর নিয়ে আর পঞ্চাশ-ষাট জন বরযাত্রী নিয়ে। তাঁরা এসে থাকবেন কন্যাপক্ষের বাড়ী থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে জঙ্গল পার হয়ে

একটা পুরোনো বাড়ী···সেই বাড়ীতে। সে-বাড়ী মেরামত করিয়ে, সাফ-সুতরো করিয়ে এঁরা রেখেচেন···লোকজন রেখেছেন—বরপক্ষীয়দের কোনোরকম অসুবিধা-অস্বাচ্ছন্দ্য না ঘটে!

এ-বাড়ীতে আমরা গিয়ে হাজির হতুম···সেখানে চলতো আমাদের থিয়েটার। বাড়ী থেকে গিরিশ-গ্রন্থাবলী চুরি করে নিয়ে যাওয়া হতো। কোনোদিন হতো 'বুদ্ধদেব', কোনোদিন 'বেল্লিক রাজা', কোনোদিন বা 'বিল্বমঙ্গল'। ছোকরা চাকর ছিল হাতে···দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা যেতুম···চাকরে জলখাবার দিয়ে আসতো বৈকালে —আমরা খুব মজায় থিয়েটার করতুম···সন্ধ্যার পর ফেরা হতো।

একদিন আমাদের থিয়েটার হচ্ছে···দলের একজন বাহিরে গিয়েছিল···ছুটতে ছুটতে সে এলো ঘরে···তার চোখের দৃষ্টি ভয়ার্ত্ত, সে হাঁফাচ্ছে। ব্যাপার কি? সে বললে—সকলে বলে, এ-বাড়ীতে ভূত আছে। ভূত তো মানি না ···তা আজ দেখেছি···ত্থাখো, আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

এ-ছেলেটি ঐ গ্রামেই থাকে···আমার আত্মীয়ের (কন্যার পিতা) জ্ঞাতির সন্তান···এঁদের বাড়ী, জমিজমা দেখেন-শোনেন এ-ছেলেটির বাবা।

আমরা হেসে উঠলুম···হাসলেও বুক ছমছমিয়ে উঠলো—তাই তো, ভূত! ভূতের গল্প শুনি···কিন্তু চোখে দেখার সুযোগ এপর্য্যন্ত হয়নি।

আমাদের এখানে দুটো হারিকেন লণ্ঠন জ্বলে···তাছাড়া

একটা এসেটিলিন ল্যাম্পও আমরা রেখেছি। এ-বাড়ীতে আমরা আসি...বাড়ীর সকলে জানেন। তাঁরা খুশী! বাড়ীতে নানা কাজের ঝামেলা...ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে, কত কি হচ্ছে...আমরা থাকলেই তো চ্যা-ভ্যাঁ...বাড়ী থেকে দূরে থাকলেই মঙ্গল!

যাই হোক, তাকে প্রশ্ন করে জানা গেল—সে বাড়ী গিয়েছিল কি কাজে...আসছে...এ-বাড়ীর কাছাকাছি আসতে হঠাৎ দেখে, একটা সাদা বাছুর...বাড়ী থেকে একটু দূরে একটা চাঁপা ফুলের গাছ, সেই গাছের কাছে। দেখে সে অবাক হয়েছিল। এধারে কারো ঘর-বাড়ী নেই ...এখানে কার বাছুর এলো! তবু মনে হলো, যদি এসে থাকে, তারা খুঁজে পাবে না...তাই বাছুরটাকে সে ধরতে গিয়েছিল। তার দিকে এগুচ্ছে...বাছুর লাফাতে লাফাতে এ বাড়ীর পিছনদিকে পোড়ো বাগান, সেই দিকে চলেছে। দেখে এ-ছেলেটি তার পিছনে তাড়া করে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য...বাগানে একটুখানি গেছে...হঠাৎ বাছুর বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো।

তখন তার মনে পড়লো ভূতের কথা! মনে হলো, লোকে বলে, এ-বাড়ীতে ভূত আছে। যেমন মনে হওয়া...অমনি পড়ি, না, মরি...সে পালিয়ে এসেছে।

আমরা দলে প্রায় আট-দশ জন। তখনি সকলে মেতে উঠলুম—নে লণ্ঠন, নে ঐ গ্যাস, চ' বাগানে। বাছুর ধরবো...ধরতে না পারি, দেখবো সেটা বাছুর, না ভূত।

গেলুম...কিন্তু কোথায় কি? তবে আজো ভুলিনি—মুখে সকলে যত দর্প করি...ভয়ে সকলের বুক ঢিপঢিপ করছিল।

কেউ তা কাকেও জানাইনি! পরে কথা হয়েছিল…সকলের তখন এমন মন যে, বাছুর কি…যদি গাছের একটা পাতা খসে পড়তো…তাহলে কি যে হতো, জানি না!

বাছুরের দেখা পেলুম না। বিয়ের তখনো দুদিন বাকি …সন্ধ্যার পর লণ্ঠন হাতে আমরা বাড়ী ফিরছি…হঠাৎ পাশে কোথায় ঝরা-পাতায় খশখশ শব্দ! চেয়ে দেখি, বাছুর নয়…একটা ছাগল—মোটা-সোটা, সাদা রঙ। আমাদের গায়ে কাঁটা! সকলে থমকে দাঁড়ালুম…সঙ্গে সঙ্গে ছাগল গেল বাতাসে মিলিয়ে। তার পর কোনোমতে বাড়ী আসা এবং এ-কথা সে-রাত্রে নয়…পরের দিন সকালে বললুম সকলকে।

বাড়ীর বড়রা হাসলেন। কিন্তু তাঁদের কাছে ছিল গ্রামের মাতব্বর এক প্রজা। সে বললে—সন্ধ্যার আগে কেন চলে আসো না গো! ভয় আছে…অমনি দেখা যায়—কেউ দেখেছে সাদা বেড়াল, কেউ দেখেছে কুকুর, কেউ দেখেছে বাছুর।

শুনলুম, শুধু ঐ দেখা।

এর পর ও-বাড়ীতে গেলেও সন্ধ্যার আগে সকলে চলে আসতুম।

এমনভাবে প্রেতযোনি দেখার গল্প আরো শুনেছি। একটা জায়গা আছে ভয়ের…কোথায় বলি। নৈহাটী থেকে গঙ্গার ধার দিয়ে ঘাটের এবং শ্মশানের গা ঘেঁষে পাকা রাস্তা গেছে দক্ষিণে ভাটপাড়ার দিকে…সেই জায়গায় শ্মশানের কাছে।

১৯০৬ সালে ভাটপাড়ায় গিয়েছিলুম আমি…বিয়ের

নেমন্তন্ন। খাওয়া-দাওয়া করতে রাত এগারোটা বেজে গেল —কলকাতায় ফেরবার ট্রেন নেই। তাঁরা বললেন, সে-বাড়ীতে থাকবার ভালো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমার সেখানে থাকতে ইচ্ছা হলো না। আমি ভাবলুম, চুঁচড়োয় যাবো। নৈহাটীর ঘাট পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে নৌকোয় চড়ে পার হয়ে নৈহাটীর ঘাটের ঠিক ওপারে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী···সেখানে গিয়ে রাত্রে থাকবো। চুঁচড়োর বাড়ীতে তখন আমার মাসিমা ছিলেন (অনুরূপা দেবীর মা)। অগ্রহায়ণ মাস। পথ জেনে নিয়ে উত্তর-মুখে হাঁটা সুরু করলুম। রাত তখন বারোটা বাজে! গঙ্গার ধার দিয়ে পথ···খানিকটা আসবার পর দেখি, লোকের বসতি নেই—চিহ্ন নেই! একদিকে গঙ্গা···গঙ্গার ধারে প্রশস্ত চড়া···আর একদিকে পথ —পথের ওদিকে ঘন বন-জঙ্গল···বড় বড় বট-অশ্বথের গাছ ···আর কী ঘন ঝোপ! শহরে থাকি···ভূত-প্রেতের কথা মনে জাগেনি। ভয় হলো, ঠ্যাঙাড়ে থাকে যদি···বরযাত্রী হয়ে ভাটপাড়ায় এসেছি···আঙুলে আছে আংটি···সোনার ঘড়ি-চেন···পার্শে প্রায় দশ-পনেরো টাকা। ঠ্যাঙাড়ের ভয় হলো। কিন্তু এতখানি পথ এসে ফিরে যেতে পারি না। কাজেই সতেজে চলতে লাগলুম উত্তর মুখে নৈহাটীর দিকে। পাশে দেখছি গঙ্গা···আকাশ একেবারে নিশ্চন্দ্র ছিল না— ফালি চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্না!

শ্মশানের কাছে এসে পৌছুলুম। আগে জানতুম না, এখানে শ্মশান আছে। জানলে কি করতুম, জানি না। কিন্তু এসেছি যখন ফেরা চলে না। বেশ মনে আছে, একটা চিতা জ্বলছিল শ্মশানে···একেবারে গঙ্গার গর্ভে।

শ্মশানের সামনাসামনি পথের উপর প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া বট গাছ। কেন জানি না, ও-গাছটা পার হচ্ছি···মাথার মধ্যে রক্ত উঠলো ছলাৎ করে···সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ···বুকে ঢিপ-ঢিপুনি! স্বীকার করতে লজ্জা করবো না···'রাম-রাম' বলতে বলতে চলেছি। গাছ পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত এগিয়েছি ···পিছনে দুম করে কি যেন পড়ার শব্দ হলো। বেল, কি, তাল পড়লে যেমন শব্দ···তেমনি শব্দ! পিছনদিকে ফেরা নয়···সমানে এগিয়ে চললুম। শুধু দৌড়ুইনি···তবে জোরে জোরে পা চালিয়ে চললুম। বুকের মধ্যে যা হচ্ছিল···যদি একটা কুকুর, কি, বেড়াল ডাকতো···হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতুম!

কোনোমতে দুটো বাঁক পার হয়ে নৈহাটীর পথে এলুম—বাঁয়ে বেঁকে ঘাট···ঘাটে এসে নৌকো নিয়ে তাতে বসা! মাঝগঙ্গায় মাঝিকে বললুম ও-পথের কথা। তারা বললে—আপনি এই রাত্রে একা ঐ শ্মশানের পাশ দিয়ে এসেছেন! বললুম—হ্যাঁ। বললুম শব্দর কথা। তারা বললে—ভালো করোনি বাবু···ওখানটায় ভয় আছে। এমন কিছু নয়···তবে ভয় পেয়ে দু-একজন অজ্ঞান হয়ে গেছলেন। তাই এখানকার মানুষরা একা ও-পথে চলে না···বেশী রাতে।

এটুকু বলে এখন ছায়ামূর্ত্তিতে ভূত দেখার কাহিনী বলি। অনেকে ছায়ামূর্ত্তি দেখেছেন, বেয়াড়া কদাকার ভয়ানক চেহারা দেখেছেন। শোনা কথা···তবে শোনা কথা হলেই যে তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়···এ-কথা আমি বলি না···তা বলা মূঢ়তা!

এই ভূত দেখা···কতজনে কত ভাবে কত মূর্ত্তিতে দেখেছেন, তা চিন্তা করবার কথা।

প্রথমেই বলি টুইডেল-পরিবারের অভিজ্ঞতার কাহিনী।

পূর্ব্বে বলেছি···তাঁরা যখন নরফোকের এচ শহরের রেক্টরিতে আসেন, তখনকার কাহিনী!

১৮০০ সালের কথা: যেদিন টুইডেল এলেন রেক্টরিতে ···সন্ধ্যার সময় বাতি জেলে তিনি বাক্স খুলে লগেজপত্র বার করছেন···তাঁর স্ত্রী ছুটে এসে বললেন—হলঘরে একজন মানুষ।

এ-কথা শুনে বাতি আর লোহার রড হাতে স্বামী গেলেন ছুটে···গিয়ে দেখেন, কেউ কোথাও নেই—সিঁড়ির মাথায় দেয়ালে টাঙানো রেকটরি-প্রতিষ্ঠাতার প্রকাণ্ড অয়েল-পেন্টিং! তিনি বললেন—ছবি দেখেছো। এ-কথা বলে তিনি ছবিখানা দেয়াল থেকে খুলে তিনতলার ঘরে তুলে রেখে দিয়ে এলেন।

তার পরও তাঁর স্ত্রী দেখলেন, মানুষ নামছে সিঁড়ি বয়ে। কিন্তু কেমন মানুষ···সে কে, দেখবেন কি···তার উপর ম্যাজের চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-মানুষ যায় বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে!

তার পরে নানা রকম শব্দ শোনেন···নানাভাবে জ্বালাতন হন। গভীর রাত্রে কে খাট তোলে, মশারি নাড়ে! এমন কি, ম্যাজ উপলব্ধি করেন বেশ সুস্পষ্ট কে যেন তার হাত ধরেছে চেপে। তার হাতে ম্যাজের হাত পড়বামাত্র সে-হাত যেন বরফের মতো গলে গেল! কিন্তু ভয়ানক ঠাণ্ডা সে-স্পর্শ! তার পর তিনি দেখেন বড় আয়নায় মানুষের

ছায়া…তার পর দেখেন সঞ্চরণশীল ছায়ামূর্ত্তি। সে-মূর্ত্তি থেকে কারো মুখের আদরা পাওয়া যায় না—শুধু লম্বা-চওড়া মূর্ত্তি…having dimensions.

এ সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর অনুশীলন চললো সমানে…প্রথম সেই ১৯০০ সালে বিচিত্র উদ্ভট শব্দ শোনা এবং ছায়ামূর্ত্তি দেখার পর থেকে টেবিল নিয়ে প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে। প্ল্যাঞ্চেটে পান স্পিরিটের লেখা…কিন্তু তার চেহারার কোনো হদিশ পান না।

শেষে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখ—রাত্রে স্ত্রীর ঘুম ভাঙলো গালে হঠাৎ ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস লাগতে এবং ঘুম ভেঙে উঠে বসে খাটের পায়ের দিকে চোখ পড়তে তিনি দেখেন, মেঘের সাদা সুদীর্ঘ কুণ্ডলী! আলোয় জ্বল-জ্বল করছে সে-ধোঁয়া (a tall column of white cloudy light reaching upto the ceiling)…সে-ধোঁয়া ছাদের তলা স্পর্শ করেছে! সে-আলো পড়েছে বিছানার চাদরের উপর…সে-আলোয় চাদরের গায়ের নক্সা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভয় পেয়ে তিনি বালিশে মুখ ঢাকলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার মাথা তুললেন…মাথা তুলে দেখলেন, সে সাদা মেঘ মিলিয়ে অদৃশ্য হয়েছে!

এই সাদা মেঘ…আলোর-আভায় জ্বলজ্বলে মেঘ…তিনি আবার ঐ মেঘ দেখলেন ৭ই এপ্রিল তারিখে ১৯০৮ সালে। স্ত্রী তখন স্বামীর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন…ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বললেন—আবার সে! এবারে স্ত্রী দেখলেন, বিছানার উপর আলোর একটা গোলা…একটা কমলালেবুর মতো! আলোর গোলা ফুলে ফুলে হলো এত-বড়। শেষে তাই থেকে

বেরুলো মানুষের মূর্ত্তি···বিছানার উপর থেকে তিন ফুট উঁচু। স্ত্রী খাটে বসলেন। তিনি বসবামাত্র সে আলোর মূর্ত্তি গুটিয়ে ছোট হয়ে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো! ১৯০৮ সালে ৮ই নভেম্বর তারিখে স্ত্রী দেখলেন, খাটের পায়ের দিকে চার ফুট ব্যাস বিশিষ্ট স্বচ্ছ আলোর আভায় জ্বলজ্বলে মেঘের রাশি (a beautiful cloud of phosphorescent light about four feet in diameter)। স্ত্রীর কাছ থেকে পাঁচ ফুট দূরে এ আলোর মেঘ! এ-মেঘ দীর্ঘ হয়ে ছাদের তলা স্পর্শ করলো —ছাদ ভেদ করে গেল। It went up straight with a steady motion and right through the ceiling. স্বামীও দেখলেন এ আলোর মেঘ! তখন ভোর সাড়ে পাচটা ···ঘরের দরজা লক করা···জানলায় ভারী মোটা পর্দা।

এর পর স্ত্রী দেখলেন···বিছানায় কে প্রচণ্ড ঘা মারলো ···তার ফলে স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। জেগে বসে স্ত্রী দেখেন, খাটের পায়ের দিকে মেঝেয় দাঁড়িয়ে দীর্ঘাকৃতি একজন পুরুষ···কালো রঙের কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা···মুখখানা শুধু বেরিয়ে আছে—বেশ গম্ভীর মুখ। মূর্ত্তির একখানা হাত খাটের পিতলের রেলিঙে···তাকে ঘিরে আলোর রেখা! স্ত্রী ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি মিলিয়ে অদৃশ্য হলো!

১৯০৮ সালের ৫ই মে তারিখে টুইডেল তাঁর দিন-লিপিতে লিখেছেন—এক অলৌকিক ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

টুইডেল-পত্নী তখন সদ্য একটি কন্যা প্রসব করেছেন। রাত্রে তিনি শুয়ে আছেন···তাঁর বেড-রুমে (আঁতুড় ঘরে)···

ড্রেসিং-টেবিলের উপর একটা জোর-আলোর ল্যাম্প জ্বলছে। তাছাড়া চাঁদের পূর্ণ জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে—জানলার পর্দা গুটিয়ে তোলা…জ্যোৎস্নার অবাধ প্রবেশ হবে ঘরে! রাত দুটো বেজে গিয়েছে…স্ত্রী একটু আগে বালিশের কাছে রাখা ওয়াচ-ঘড়িতে সময় দেখেছেন। ঘরের দরজা ভেজানো …তবে লক করা ছিল না। পাশের ঘরে নার্শ শুয়েছে। নার্শের ঘর আর ম্যাজের ঘর…দু ঘরের মাঝখানের দরজা খোলা…এই মাঝখানেব দবজায় একটি পর্দা আছে। হঠাৎ ঐ মাঝখানেব দরজার পর্দার আড়াল থেকে ঝকঝকে সাদা আলোর একটা বল দেখা গেল (a ball of white phosphorescent light)। বলটা গড়াতে গড়াতে এলো খাটের কাছে। তার পর বলটা বেড়ে দীর্ঘ হলো… আলোর একটা থামের মতো হয়ে দাঁড়ালো…মানুষের মাথা-প্রমাণ উঁচু মাথা। তার পর থামে ফুটলো মানুষের মুখ, মাথা। তার পর মানুষ এলো এগিয়ে খাটের গা ঘেঁষে। ম্যাজ দেখছেন। তিনি দেখলেন, মানুষের পাশ ঘেঁষে গা ঘেঁষে সাদা আলোর সুতো যেন—a stream or cord of phosphorescent light. সে-আলো ছড়িয়ে পড়লো বিছানার উপর। শিশুকন্যা ঘুমোচ্ছে…তাকে ঘিরে টুপির মতো আকার হলো এই আলোর সুতোর! ম্যাজ দেখলেন, সে-আলো গায়ে পড়তে শিশু হাত-পা নাড়তে লাগলো… নৃত্যছন্দে! ম্যাজের ভয় হলো…ম্যাজ বললেন কাতর কণ্ঠে—দয়া করে ওকে নেবেন না! সঙ্গে সঙ্গে আলো গেল মিলিয়ে! ঘরে যে ল্যাম্পের আর চাঁদের আলো…সে-আলোয় ম্যাজ দেখেন, শিশু আরামে ঘুমোচ্ছে। নার্শ একটু পরে

এ-ঘরে এলো। নার্শ আসতে ম্যাক্স তাকে এ-কথা বললেন। নার্শ বললে—আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি ··হঠাৎ মনে হলো, কে যেন আমার বিছানার চাদর ধরে টানছে! ঘুম ভেঙ্গে গেল···উঠে এ-ঘরে আসছি।

দুজনে তখন দেখেন, শিশু শয্যায় প্রস্রাব করে ফেলেছে। শিশুর বিছানা বদলে দেওয়া হলো। টুইডেল লিখেছেন—এর পর থেকে স্পিরিটের আবির্ভাব হলো বেশ সঘন এবং তার সে-আবির্ভাব আমরা বুঝতুম বিচিত্র নানা শব্দে এবং নানা রকম অদ্ভুত আলো দেখে! The objectivity and reality of the apparition were abundantly proved on many occasions এবং কিছুদিন পরে···টুইডেল লিখেছেন—স্পিরিট বা ছায়ামূর্ত্তির সঙ্গে ম্যাক্স (স্ত্রী) কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। এমন ব্যাপার লক্ষ্য করলেই স্ত্রী বলতেন—আপনি কে? জবাব শুনতেন—আমি সে···সে···সে। ম্যাক্সের প্রশ্ন এবং ছায়ামূর্ত্তির জবাব···টুইডেল লিখেছেন—আমার ছেলে হার্শেল (বয়স তখন পাঁচ-ছ বছর) বহুবার শুনেছে।

টুইডেলও ক্রমে দেখতে লাগলেন রাত্রে কোথাও কিছু নেই···হঠাৎ খানিকটা আলো! এ-আলো চলে চলে বেড়াচ্ছে! তাঁর স্ত্রী একবার বলেছিলেন—তোমাকে ছুঁতে পারি? এ-প্রশ্ন করবামাত্র কণ্ঠ শুনলেন—ধরো আমার হাত। ম্যাক্স হাত বাড়াতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন হাতের স্পর্শ! অদৃশ্য হাত অবশ্য···কিন্তু এ-স্পর্শ বেশ তপ্ত···জীবন্ত মানুষের হাতের স্পর্শের মতো।

মূর্ত্তি দেখবার আর একটি কাহিনী বলি :—

লণ্ডনের এক সাইকিক-চক্রে হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে

উঠলেন—ইস···এ যে হার্কুলিস! সকলে প্রশ্ন করলেন—কোথায়? কি দেখচো?

যিনি ও-কথা বললেন···তাঁর নাম জেকব। জেকব বললেন—দরজার পর্দ্দার পাশে দাঁড়িয়ে···ছায়ামূর্ত্তি! কী মাশল্···আর কী লম্বা দেহ! পরণে কৌপীন···রীতিমত জোয়ান। মাথায় ছ ফুট লম্বা···ঐ আসছে···মিডিয়ামের কাছে এসে দাঁড়ালো!

তার পর আরো অনেকে দেখলেন, মিডিয়ামের পিছনে আলো-জ্বলজ্বল বাষ্পের স্তম্ভ—a pillar of luminous vapours, not flame···আলো-বাষ্পের এ-থাম কাঁপছে। কখনো বেশ প্রসারিত হচ্ছে ··আবার পরক্ষণে সঙ্কুচিত হচ্ছে। এমনি প্রসারণ আর সঙ্কুচন হতে হতে সেটা মানুষের আকার গ্রহণ করলো···স্পষ্ট মানুষ!

দেখে জেকবের স্ত্রী বলে উঠলেন—আমার ঠাকুর্দা! অবিকল সেই চেহারা। দু-চার মিনিট পরেই মূর্ত্তি বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো!

বহু সাইকিক সোসাইটির বহু সদস্য বললেন—মিডিয়াম-চক্রে অনেক সময় আলোর-ধোঁয়ায় মেশা মূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটতে তাঁরা দেখেছেন।

অনেকে দেখেছেন, ছায়ার হাত···অর্থাৎ যে-হাতের বাস্তব অস্তিত্ব নেই···জলের গ্লাস তুলেছে—etheric hands in action is seen···then lift a glass of water.

একজন প্রসিদ্ধ সাইকিক লিখেছেন—I have had them touch my knees beneath a table while slate writing was going on. মিডিয়ামের হাত রীতিমত

কনট্রোলে রেখে দেখা গিয়েছে, স্পিরিটের হাত অর্থাৎ ঐ মিডিয়ামের হাতই পেন্সিল নিয়ে স্পিরিটের নাম যথাযথ সহি করেছে।

বারো

ফুলের বনে ফুল ফোটায় ফুলপরী

এবারে যে-কথা বলবো, সে-কথার গোড়ায় বিশেষ কটি কথা আছে বলবার। তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক বা সংস্কারের দোহাই দিয়ে পরলোক এবং পরলোকতত্ত্বের বিচার-অনুশীলন না করে পাশ্চাত্য জগতে রীতিমত বিজ্ঞানসম্মতভাবে আজ প্রায় একশো বছর ধরে এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা এবং পরীক্ষা চলেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে এ-বিষয়ে এত বেশী তথ্য আবিষ্কার এবং প্রত্যক্ষ করেছেন যে পুরাণে বা পাশ্চাত্য Fables ও Folk-loreএ-বর্ণিত পরী দৈত্য দানা দেবতা অসুর প্রভৃতিকে কল্পনার জীব বলে মনে হয় না···তাঁরা এ-যুগেও দৈত্য দানা পরী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন! এ সম্বন্ধে বেশ নৈষ্ঠিক সাইকিকের দু-একখানি গ্রন্থে যে-সব কাহিনী পড়েছি, বলবো।

কিন্তু সে-কাহিনী বলবার আগে তাঁরা বৈজ্ঞানিক ধারায় যে-তথ্য-প্রমাণ লাভ করেছেন, তা বলা প্রয়োজন।

লোহা, কাঠ প্রভৃতি বস্তু কঠিন। বিজ্ঞান বলে, solid substance. বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—লোহা, কাঠকে আমরা বলি শক্ত জিনিষ···কিন্তু আসলে স্পর্শে ওগুলি শক্ত বুঝি···তোলবার সময় বুঝি, বেশ ভারী জিনিষ। বিজ্ঞানের মতে, পৃথিবীর সব জিনিষই কতকগুলি ইলেকট্রন এবং

প্রোটনের সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী অণু-পরমাণুর যোগে এক-একটি জিনিষের সৃষ্টি। বিজ্ঞান বলে—এই অণু-পরমাণুগুলি আবার ইলেকট্রন এবং প্রোটনের যোগে গঠিত। কোন্‌টা কি জিনিষ, তা আমরা জানতে পারি ইলেকট্রনের দৌলতে এবং জিনিষ ভারী, না, হাল্কা, এটুকু আমরা জানতে পারি প্রোটনের কল্যাণে। যে-জিনিষে প্রোটন যত বেশী, সে-জিনিষ সেই হিসাবে হয় ভারী কিম্বা হাল্কা। লোহায় প্রোটন অনেক বেশী, কাঠে তার চেয়ে কম…এজন্য কাঠের চেয়ে লোহা বেশী ভারী। আবার এক টুকরো লোহায় যত অণু-পরমাণু আছে, তাতে ইলেকট্রন এবং প্রোটন যা থাকে…তার একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকে; লোহায় যে ইলেকট্রন আর প্রোটন…কাঠের ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সঙ্গে তার আবার তফাৎ আছে; দুয়ে দু-রকমের ইলেকট্রন এবং প্রোটন; তাই লোহা লোহা, কাঠ কাঠ। সব বস্তুর সম্বন্ধে ঠিক এই এক কথা বলা চলে। প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রকে বলে—neucleus…সূর্য্যমণ্ডলে যেমন সূর্য্য, অণুতে তার কেন্দ্রও ঠিক তেমনি neucleus।

এঁরা বলেন—সূর্য্যকে কেন্দ্র করে যেমন শত শত গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে…তেমনি অণু-পরমাণুর এই neucleusকে কেন্দ্র করে তার চারিদিকে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের অবিরাম ঘূর্ণন চলেছে। আর এ-আবর্ত্তনের বেগ এমন বিপুল যে তার জন্যই আমরা কোনো জিনিষকে দেখি solid… কোনোটাকে বা liquid.

এই বৈজ্ঞানিক সত্যে নির্ভর করে প্রসিদ্ধ পরলোকতত্ত্ববিদ আর্থার ফিণ্ডলে তাঁর The Book of Truth or

Spiritualism the Comings World-Religion বইয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এই বিরাট বিশ্ব 'শুধু বিরাট vibration বা কম্পনের সমষ্টি মাত্র' এবং বিশ্বপৃথিবীর যে সামান্য অংশ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা যাকে আমরা বলি, স্থূল জগৎ...সেই জগতে প্রতি ইঞ্চি-পরিমাণ স্থানে vibration চলছে ৩৪০০০ থেকে ৬৪০০০। সময়ের হিসাবে প্রতি সেকণ্ড-এ vibration-এর মাত্রা—চার লক্ষ কোটি থেকে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি! বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এ-তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে...সুতরাং এ সম্বন্ধে সংশয় করা চলে না।

যে-আলো আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে-আলোর চেয়ে অনেক-বেশী তীব্র আলো হলো Ultra-Violet, X-Ray, রেডিয়ো এবং টেলিগ্রাফের আলোক-তরঙ্গ।

আকাশ জুড়ে প্রতি সেকণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ইথরের তরঙ্গ ছুটেছে। আমরা যাকে আলো বলি, যে-আলো আমরা প্রত্যক্ষ করি...সে-আলো আমরা পাই ঐ ইথরের তরঙ্গ থেকে। স্থূল জগতের প্রতি ইঞ্চি পরিমিত স্থানে এই ইথর-তরঙ্গ আছে এবং চৌত্রিশ হাজার থেকে চৌষট্টি হাজার ইথর-তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। এঁরা বলেন—তার পরেই Etheric world. আমাদের ইন্দ্রিয় যে-কম্পন বা vibration ধরতে পারে, সেখানে হলো ইথর-তরঙ্গের সীমা। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাধ্য নেই ইথিরীয় জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখবে! আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক দৃশ্যমান physical environments-এর মধ্যে। ইথিরীয় জগৎ কতদূরে নিহিত, তা আমাদের জানা নেই...জ্ঞানের অগোচরে তা জানতে হলে বিশেষ সাধনা চাই।

ফিণ্ডলে আরো বলেছেন—সব বস্তু বা substance ঐ vibration বা স্পন্দনের ফলে প্রসূত। জলে যেমন মাছ থাকে, মরজগতে আ'মরাও তেমনি ইথরের মধ্যে বাস করছি···কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রকেই আমরা জানি, চিনি। Death is our severance of this etheric body of structure from the physical body. কিন্তু এত তত্ত্ব নিয়ে আমরা আপাততঃ আলোচনা করতে বসিনি।

ইথরের কথা বললুম শুধু পরী দৈত্য দানার কথার ভূমিকার স্বরূপ।

ইথরের vibration-এর বেগের মাত্রায় তারতম্য আছে—এ-কথা এ-যুগের বিজ্ঞান স্বীকার করে। বিজ্ঞান এ-কথা স্বীকার করে যে Vibration of ether is the cause of all material both in this visible and invisible world of physical experience. বাস্তব matter-এর তিনটি রূপ আমরা দেখি—solid, liquid, gas; Ether হলো চতুর্থ অবস্থা (state)। বিদ্যুতেরও তেমনি তরঙ্গপ্রবাহ আছে—physical matter-এর সম্পর্কে তারো মূল্য অসামান্য।

বিজ্ঞান বলে—All these rates of vibration interpenetrate each other in the same way that solids, liquids and gases are all present in a sponge filled with water—the sponge being solid···the water liquid and the gases themselves composing the water অর্থাৎ

vibration বা কম্পনের বিভিন্ন মাত্রার পরস্পরে এমন মাখা-মাখি যে তারা মিলেমিশে আছে স্পঞ্জের মতো। স্পঞ্জে যেমন solid, liquid এবং gas আছে—স্পঞ্জ হলো solid, তারপর জল হলো liquid এবং গ্যাস ··এই গ্যাস আবার জলে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাস্তব জগৎ বা physical world-এর চারিদিকে তেমনি astral বা ইথর এবং মনের ক্রিয়া (mental activities) পরস্পরে সেলাই-বুননের মতো মিলে-মিশে আছে···and intimately associated with its phenomena. আমাদের জীবন···life বিশ্লেষণ করলে আমরা কি পাই? Cell-growth··· বিভিন্ন কোষগুলির বেড়ে ওঠা···variation of structure ···গঠনের বৈচিত্র্য প্রভৃতি। এর কারণ এখনও মানুষের অপরিজ্ঞাত।

এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব (subtler rates of vibration) উপলব্ধি করতে হলে চাই আমাদের অনুভূতির ইন্দ্রিয়গুলির সম্যক উৎকর্ষ···the organs of perception must first be developed. উপলব্ধির মূল ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথভাবে tune করা প্রয়োজন—to respond to the order of material which they are meant to investigate. এইখানেই একাগ্র সাধনার কথা আসছে। যেমন ধরুন, একজনের কণ্ঠ মিষ্ট···কিন্তু কণ্ঠ মিষ্ট হলেই মানুষ ভালো গাইতে পারবেন, এমন কোনো কথা নেই এবং তা ঘটতে দেখা যায় না। গানের সাধনা চাই··· কণ্ঠসাধনা চাই···সাধনার গুণে অপেক্ষাকৃত 'খারাপ' গলাও চমৎকার উৎকর্ষ লাভ করে; সাধনার অভাবে খুব মিষ্ট গলায়

গান ফোটে না। কাজেই এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য রীতিমত সাধনা চাই। আমাদের ইন্দ্রিয়াদির শক্তিসামর্থ্য সীমাবদ্ধ; সে-সীমা অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ সাধন করা যায় বিশেষ সাধনায় বা অনুশীলনে। ব্যায়াম-সাধনায় দুর্বল মানুষের দেহ যেমন শক্ত-সমর্থ কর্ম্মঠ হয়... তেমনি সাধনায় এবং অনুশীলনে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির এমন উৎকর্ষ সাধন করা চলে যে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার সমূহও তখন আমাদের উপলব্ধির নাগালে আসে।

উৎকর্ষের ফলে ইন্দ্রিয়াদি হয় refined এবং তার ফলে সূক্ষ্ম বিষয়াদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়।

পরলোকতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন—এইটিই হলো Clairvoyance-এর মূল কথা। Clairvoyance-এর সঙ্গে মিডিয়াম বা মনের অচেতন-আচ্ছন্ন ভাবের কোনো সম্পর্ক নেই। Clairvoyance হলো উৎকর্ষ-লব্ধ ইন্দ্রিয়াদির উপলব্ধি-শক্তির পরিচয়। এর ফলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়।

সাধনায় এ-শক্তি লাভ করে অধ্যাত্ম বা পরলোকতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মিষ্টার হডশন চর্ম্মচক্ষে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন...তার পরিচয় তিনি লিখে প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

গল্পে-পুরাণে অতি প্রাচীন যুগ থেকে আমরা পড়ছি পরী দৈত্য দানা রাক্ষসের কথা। সে-সব গল্পকথা কাল্পনিক, অলীক বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু হডশন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে বলছেন—কল্পনা নয়, অলীক নয়...পরী, দৈত্য, দানা প্রভৃতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কথা তিনি

লিখেছেন ; তার কারণ, যাঁরা এ-তত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করছেন…তাঁরা নিষ্ঠাভরে যেন এ-দিকটার অনুশীলন করেন। তিনি বলেন—ভারতের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা 'দেবতা'র কথায় লিখেছেন…তাঁরা জ্যোতির্ম্ময় আত্মা। হডশন বলেন, It includes all ordees of nature spirits, angels and the lesser gods. বনের দেবতা, জলের দেবতা প্রভৃতির কথা। তিনি বলেন—কল্পকথা নয়…সত্যই nature gods আছে। মানুষ যদি সাধনায় মন এবং ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ সাধন করে, তাহলে তাঁরা চর্ম্মচক্ষে এ-সব দেবতাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

গাছের গেঁড় বা বীজ থেকে অঙ্কুর দেখা দেয়। হডশন দেখেছেন, বীজ বা অঙ্কুর থেকে চারা গজাবার ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ অতি-ক্ষুদ্র সাব-মাইক্রশকোপিক ইথিরিক জীব ঐসব জাগরণশীল চারার চারিদিকে…large numbers of small submicroscopic etheric creatures are moving about in and around the growing plants. এগুলির ইথিরীয় রূপ তিনি দেখেছেন আলোর অতি-ছোট-ছোট বিন্দুর মতো…শিকড়ের চারিদিকে চক্রাকারে সে-সব বিন্দু ঘুরছে…সেগুলির মধ্যে ঢুকছে বেরুচ্ছে… they are visible etherically as points of light, playing around the stems and passing in and out of the growing plant. বাতাসে ভেসে চারার মাথা পর্য্যন্ত সে-সব জীবের ওঠবার সামর্থ্য আছে ; তারো চেয়ে আরো উর্দ্ধে উঠতে পারে কি না, তিনি তা বলতে পারেন না…কারণ চারার মাথা ছাড়িয়ে আরো

উর্দ্ধে ওঠা···তিনি তা কখনো প্রত্যক্ষ করেননি। এ-সব জীব বায়ুমণ্ডল থেকে কি যেন গ্রহণ করে···করে চকিতে আবার চারার মধ্যে মিশে যায়···তারপর চারা থেকে বেরিয়ে আসে। They absorb something from the atmosphere, re-enter the tissue of the plant and discharge it. এ-ধারা চলেছে অবিরাম। এ-সব জীব এ-ব্যাপারে একেবারে একাগ্র তন্ময় হয়ে লিপ্ত···যেন কি করছে···সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান আছে পরিপূর্ণ রকম!

এ-চারা বাড়ছে, বাড়ছে এবং চারার এই বেড়ে ওঠার সঙ্গে এ-সব জীবও আকারে বেড়ে ওঠে···তখন তাদের দেখায় ফিকা ভায়োলেট রঙের কিম্বা লিলাক রঙের ছোট ছোট গোলকের মতো—ব্যাস দু ইঞ্চি এবং ঐ গোলক থেকে সূক্ষ্ম রেখায় আলোর রশ্মি বেরোয়—দেখা যায়। এই ইথিরীয় জীবগুলি আকারে এক ইঞ্চি পরিমিত দেখা গিয়েছে; সাধারণতঃ এক ইঞ্চি হলেও চার ইঞ্চি, ছ ইঞ্চি পরিমিত লম্বা আকারের জীবও হডশন প্রত্যক্ষ করেছেন।

ব্যাপার আগাগোড়া শুধু vibration···কম্পনেই পরিলক্ষিত হয়। দেখে মনে হয়, অঙ্কুর থেকে চারাকে গজিয়ে তোলাই যেন তাদের কাজ! এরা বায়ুমণ্ডল থেকে যথাযথ পরিমাণ বায়ু নিয়ে বীজ বা অঙ্কুরের চারিদিকে চালিয়ে সে-বায়ুকে চারার গায়ে লাগিয়ে চারাকে প্রাণ দেয়, বাড়িয়ে তোলে। তারা যেন ওদের গড়ছে, লালন করছে, বড় করে তুলছে। এমনিভাবেই উদ্ভিদের জন্ম এবং লালন-কার্য্য চলে। The variety of forms is endless. উদ্ভিদকে কত না বিভিন্ন আকার দিয়ে, রূপ দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে।

হডশন বলেন—Earth, water, air and fire-sprits·· মাটি, জল, বাতাস এবং ঐ জ্যোতির্ম্ময় জীব···এরাই উদ্ভিদের সৃষ্টি আর লালন করছে। তাই থেকে লৌকিক জগতে বনদেবতা কথার সৃষ্টি! প্রাচীন যুগ থেকে মনুষ্যসমাজে বনদেবতা কথাটা চলিত হয়ে আসছে এবং এরাই কাব্যে, গল্পে, পুরাণে gnomes, devas, spirits, fairies প্রভৃতি নামে অভিহিত।

অনেকে বলেন—জ্ঞানে মানুষের মন সংস্কারমুক্ত হওয়ার দরুণ কাব্য-কাহিনী থেকে এদের কথা বিলুপ্ত হয়েছে। হডশন বলেন—তা নয়। মানুষ এ-যুগে বড় বেশী জড়বাদ-মতের দাস্ত করেছে। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ বা ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ-সাধনে বীতরাগী বলে সূক্ষ্ম জগতের এ-সব জীবকে মানুষ এখন প্রত্যক্ষ করতে পারে না। হডশন বলেন—Tiny etheric creatures working in the grass run about like gnats in the sun; অনেক সময় রোদে বা মেঘলা দিনে মাঠের তৃণাদির গায়ে আমরা অতিক্ষুদ্র জীবের কম্পন-বেগ লক্ষ্য করি। সেগুলো কি লক্ষ্য করি···যদি তার অনুশীলনে একাগ্রভাবে মনোযোগী হই, তাহলে হয়তো বহু অজানা তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

জ্যোতিরশ্মির মতো এই সব অলৌকিক জীবের সম্বন্ধে হডশন বহু অনুশীলন, বহু পরীক্ষা করেছেন। যে-সব কাহিনী তিনি লিখেছেন···কল্প-কথা বলে উড়িয়ে না দিয়ে যদি কেউ এ-সম্বন্ধে সুগভীর অভিনিবেশ এবং নিষ্ঠা নিয়ে অনুশীলন করেন, সেই কথা ভেবে তাঁর লেখা কটি কাহিনী সঙ্কলিত করছি।

তিনি যে-সব জ্যোতির রেখা বা জ্যোতির বিন্দুর মতো স্পিরিট প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের শ্রেণীবিভাগ তিনি করেছেন। নানা জাতের স্পিরিট Brownies and elves, gnomes, mannikins, undines and sea-spirits, fairies, sylphs, Devas এবং Nature-spirits.

পরের পরিচ্ছেদে তাদের কাহিনী বলছি।

তেরো

যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষে-মানুষে
ভেদ কত…সংখ্যা নাই তার !
সবার কল্পনা…সে কি মিথ্যা মরীচিকা ?
অদেখা যা…তা নিয়ে কারবার !

ব্রাউনি :—

হডশন লিখেছেন—নানা জাতের ব্রাউনি দেখেছি। কতকগুলি খুব ছোট পাতলা গড়নের, কতকগুলো মোটা-সোটা ; তাদের দেহ খর্ব, গম্ভীর শান্ত গোছ…আবার কতকগুলো বালকের মতো চঞ্চল, মাথায় চার ফুট থেকে ছ ফুট লম্বা, মুখগুলো মানুষের মুখের মতো…তবে বুড়োর মুখ যেন ! চোখ আছে, ভ্রূ আছে, গোঁফও দেখেছি। গায়ের রঙ টকটকে লাল, চোখ ছোট ছোট ফুট্‌কি। আমি যে-সব ব্রাউনি দেখেছি…দেখেছি, তারা গাছের গোড়ায় মাটিতে…ছোট বড় নানা সাইজের গাছের গোড়ার চারিদিকে ঘুর-ঘুর করছে…পিঁপড়ের বা পোকার মতো আকার নয়, আকার মানুষের মতো…যেন গুড়িয়া পুতুল !

তিনি লিখেছেন—২৮শে জুন, ১৯২২ :

লেক ডিষ্ট্রিক্টে গিয়েছিলুম। সেখানে ঘন বন। বনে ওক আর হাজেল গাছ অজস্র। বনের একদিকে পাহাড়… পাহাড়ের কোলে নদী…নদীর নাম থিলমিয়ার—নিরালা জায়গা। এখানে অনেক ব্রাউনি দেখলুম ··যেন ব্রাউনিদের কলোনি! গাছের গোড়া ঘেঁষে মাটীতে তাদের জটলা… লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। মাটী খুঁড়ে তৈরী বসতির মতো কতকগুলো কি দেখলুম…পিঁপড়ের বাসার মতো। সেই সব বাসায় তারা ঢুকছে, বাসা থেকে বেরুচ্ছে। বাসাগুলি দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। কারিগরি আছে। গর্ত্ত খুঁড়ে বাসা…কিন্তু সবগুলোর মাথায় ছাউনি আছে…গাছের শুকনো পাতা কিম্বা ছাল—perfect in shape. এসব ঘর বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে…গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি ঠাশাঠাশি নয়।

মাথায় ছ-ইঞ্চির বেশী একটিকেও দেখিনি। চেহারা ঠিক বুড়ো মানুষের মতো…মাথার গড়ন এমন যে মনে হয়, মাথায় কানাওয়ালা বাদামী রঙের টুপি এঁটেছে। তাদের দেখে মনে হয়, যেন ঘরগেরস্থালী আছে; তবে মেয়ে-জাতের ব্রাউনি একটিও আমার চোখে পড়েনি। আমি বসে বসে দেখেছি …দেখেছি মুগ্ধ হয়ে বিস্মিত হয়ে। তাদের কতকগুলো এলো আমার কাছে…এসে থমকে দাঁড়ালো। যেন আমাকে দেখছে—আমার কাছ থেকে তিন গজ দূরে তারা এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি হাত নাড়লুম…অমনি সকলে দে ছুট!

আমার কৌতূহল হলো, ঘর কেমন…দেখবো। ভাঙলুম ঘরের মুখটা…যাকে বলে দরজা। ভাঙতে দেখি, ঘর বলে কিছু নেই…অথচ মাটি ঠেলে উঁচু করে এমনভাবে

রাখা···মনে হয়, যেন ওর মধ্যে ঘর আছে। কিন্তু না, ঘর নেই···ঢিপি। ভাঙতে দেখি, প্লেন জমি। বাইরে থেকে দেখায় কিন্তু সারে-সারে কটা ঘর···বাইরে থেকে দেখায় ছবির মতো!

এল্‌ফ্‌—Elves: এদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—এল্‌ফ্‌দের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুব সামান্য। এদের চেহারা মোটে ব্রাউনির মতো নয়। ব্রাউনিদের দেখলে মনে হয়, এমন তাদের গড়ন···মনে হয়, যেন পোষাক-আসাক পরে আছে। এল্‌ফ্‌রা তেমন নয়···এরা যেন জিলাটিনের তাল···ভিতরটা ফাঁপা বলে মনে হয় না।

কটিংলির জঙ্গলে ১৯২১ সালে অগষ্ট মাসে দুটি এল্‌ফ্‌ দেখেছিলুম। আমরা কজন মিলে ঘুরে ঘুরে মোটা একটা গাছের গুঁড়িতে বসে বিশ্রাম করছি···এমন সময় দেখি, ছোট দুটি এল্‌ফ্‌—আমাদের কাছ থেকে পাঁচ-ছ ফুট দূরে! আমাদের দিকে আসছিল···আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালো···যেন তাজ্জব কিছু দেখছে! এদের গা যেন টাইট চামড়া দিয়ে ঢাকা···ভিজে থাকলে সে-চামড়া সাটিনের মতো ঝক-ঝক করে···চামড়ার রঙ গাছের ছালের মতো। হাত আছে, পা আছে···জিলাটিনের তাল থেকে হাত-পা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। হাত-পাগুলো ফড়িঙের পায়ের মতো সরু···কিন্তু বেশ লম্বা। বড় বড় কাণ···নাক ছুঁচোলোপানা···মুখ আছে···চ্যাটালো···দাঁত নেই, জিভও নেই। তাদের দেহ থেকে বেরুচ্ছে সবুজ আলোর রশ্মি। আমরা হাততালি দিতেই গাছের ডালের ফাটলে ঢুকে অদৃশ্য হলো! তার পর দেখি, সেখান থেকে বেরিয়ে মাটীর গর্ত্তে প্রবেশ।

নোমস্ (Gnomes) সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—এরা earth-spirits শ্রেণীর জীব। এরাও পরীর জাত। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক, প্রাণিতত্ত্ববিদ এবং পর্য্যটকেরা বিজ্ঞানের বইয়ে যেন এদের কথা লেখেন! নানা জাতের নোমস্ দেখেছি। এরা দেখতে কৃশকায়। চেহারা দেখলে হাসি পায়···উদ্ভুট্টে চেহারা···কদাকার কুশ্রী···চোয়াল যেন লণ্ঠনের মতো। এরা দল বেঁধে থাকে না···একা একা থাকে। দেখলে মনে হয়, আদ্দিকালের বুড়ো। হাত খুব লম্বা···বেয়াড়া রকম লম্বা···পা দুখানা যেন বাতে অনড়···গা গিরিগিটির মতো কর্কশ···চোখ ছোট কুৎকুতে। ইংলণ্ডের বনে-জঙ্গলে এখনো বিস্তর নোম দেখা যায়। গাছে-পাহাড়ে নোমের বাস ; লোকালয়ে, বাড়ীঘরেও নোম দেখেছি।

গেছো নোম : প্রেষ্টনের কাছে জঙ্গলে দেখেছি···১৯২১, সেপ্টেম্বর মাসে···একটা আশ গাছ···তার নীচের ডালে নোম দেখেছিলুম—মাথায় আড়াই ফুট লম্বা···দৌড়ুবার শক্তি অসামান্য। মাঠের উপর নোমকে আমি ছুটতে দেখেছি ঘণ্টায় বিশ মাইল রেটে। তাছাড়া ঘাসের ভিতর দিয়েও অনায়াসে ছুটে যায়···বাধা মানে না।

একদিন গাছে একটা নো'ম দেখে আমি ধরতে গিয়েছিলুম। গাছে যখন থাকে, আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। গাছের ফাটলের মধ্যে থাকে। যে-গাছের ফাটলে থাকে, সে-গাছের গুঁড়ি দেখেছি স্বচ্ছ—the trunk of the tree grows transparent with a gnome in the centre as in a glass-case···তফাৎ শুধু এই যে, গাছের গা বেশ solid··· অথচ তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় নোমকে। মানে,

তখন তাকে নোম বলে চেনা যায় না—যেন খানিকটা আলো জলছে! গাছ থেকে সরে পড়বার সময় আলো নিবে নোম-মূর্ত্তি প্রকাশ পায়—When it desires to leave the tree, the first phenomenon that I can see is that he slowly assumes the gnome form·· Having assumed the form he steps out on the ground—গাছ থেকে সে মাটীতে নামে।

পাহাড়ী নোম: ১৯২২ সালের জুন মাসে দেখি লেক ডিষ্ট্রিক্টের এক পাহাড়ে। আলোর বাণ্ডিল যেন! পাহাড়ের যে-জায়গায় থাকে, সে-জায়গাটুকু শুধু আলোয় আলো···যেন মশাল জলছে! সে-আলো কখনো প্রসারে বাড়ছে, কখনো সঙ্কুচিত হচ্ছে···কখনো বেশ জোরালো আলো, কখনো বা স্তিমিত হয়ে আসছে!

ঘরোয়া নোম: ১৯২২, জুন মাসে দেখেছি, পাহাড় থেকে নেমে লোকালয়ের দিকে চলেছে। দেখেছি, মানুষের মতো ধরণধারণ···চেহারা ঐ একই রকম। মানুষজনকে দেখছে···দেখে ভয় নেই, ডর নেই! যেন তাদের সঙ্গে কত কালের পরিচয়! 'আলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' বইয়ে 'ক্যাটার পিলারে'র যে-ছবি আছে···এর চেহারা অবিকল তার মতো। এ-জাতের কৌতূহলের মাত্রা যেন বড় বেশী···যেন সব কিছু দেখতে চায়, বুঝতে চায়, জানতে চায়! একে আমি লক্ষ্য করতে লাগলুম। দেখলুম, একটা বাড়ীতে ঢুকলো···কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে রইলো না···একটু পরেই বেরিয়ে, দেখি, হন হন করে চলেছে লেকের দিকে। আমি তার উপর নজর রেখে চলেছি···আমার দিকে তার লক্ষ্য নেই, কিম্বা আমাকে হয়তো

গ্রাহ্য নেই তার! দেখি, লেকের জলের ধারে গিয়ে একটা পাতা গুড়িয়ে ঠোঙার মতো করলো…করে সেই ঠোঙায় জল ভরে পান। তারপর গিয়ে পাহাড়ে উঠলো।

প্রেষ্টনের মাঠে **নৃত্যশীল নোম** দেখেছি। এদের দেখে মনে হয়, এরা এখনো নীচু স্তরে আছে—at a lower stage of development. আকারে চার থেকে ছ ইঞ্চি উঁচু। ক-বছর আগে গার্ডনার একটি নোমের ফটো তুলেছিলেন (সে-ফটো আছে তাঁর লেখা Faries নামক গ্রন্থে)—সেটা এই নীচু জাতের নোম। গেছো নোমের সঙ্গে এ-জাতের নোমের তফাৎ এই যে এরা থাকে দল বেঁধে, নেচে বেড়ায় দল বেঁধে। এদের গায়ের রঙ বহু-বিচিত্র। সে-রঙে নানা শেড…যেন কে তুলি হাতে নিয়ে সযত্নে শেড মিলিয়ে গায়ে রঙ ফলিয়েছে! অর্দ্ধ-চক্রাকারে আমি এদের নাচতে দেখেছি। এদের হাতগুলো বেশ লম্বা, পাখনা আছে…বাদুড়ের পাখার মতো পাখনা! পাখনার রঙ খুব ঘন কালো; পাখনা মসৃণ, পাখনায় লোম আছে, খুব মিহি পাখনা …বোলতার পাখনার মতো। এদের গতি তেমন ক্ষিপ্র নয়… চলন ধীরে ধীরে।

জলার নোম: রাইসডেলে পাহাড়-ঘেরা জলায় দেখেছি ১৯২২, নভেম্বর মাসে জলার নোম। ঝোপে-ঝাড়ে দেখেছি। মাথায় আঠারো ইঞ্চি থেকে দু' ফুট লম্বা, রঙ ঘন ব্রাউন…মুখ, গা ঐ একই রঙের। নাক লম্বা, বাঁকা…টিয়ার ঠোঁটের মতো, চোখ কালো…তবলকির মতো। গায়ের চামড়া কর্কশ…স্পঞ্জের মতো…sponges texture. ঘাড় থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত এমন গড়ন যে মনে হয়,

যেন নিকার এঁটে আছে। বাতাসে ভেসে এরা চলে… বেশ ক্ষিপ্র বেগে।

আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল একটা নোম। আমি তার পানে চেয়ে আছি…দেখছি, তাকে দেখছি…হঠাৎ কপালের মাঝখান থেকে একটা নোম এমন উজ্জ্বল আলোভরা কুয়াশা বর্ষণ করলো যে আমার চোখ জলে যাবার জো! সারা মুখ সে কুয়াশা-বাষ্পে ভিজে গেল! আমি ইথিরীয় দৃষ্টিতে দেখছিলুম। সেটা ছিল আমার কাছ থেকে পনেরো গজ দূরে—আমার চোখ রীতিমত ধাঁধিয়ে দিয়েছিল!

এরা হলো মাটীর পৃথিবীর জীব…পৃথিবীর মাটীতেই ওদের বাস—উড়তে পারে বলে মনে হলো না।

তার পর আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার যা লক্ষ্য করেছি… বলি। আমি তাদের বেশ একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছি…এমন সময় কি তাদের খেয়াল হলো, তারা যেন বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো! আলোর কতকগুলো মার্বেলের মতো তারা মাটীতে পড়ে মাটীর মধ্যে ডুবে গেল! এভাবে মিলিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো চেষ্টা-চরিত্র বা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়নি। বুঝলুম, এদের স্বভাবই এমনি। নিজেদের খেয়াল হলে এমনিভাবে এরা মাটীর গর্ত্তে গিয়ে ঢোকে—Herd-instinct-এর ফল মাত্র।

ম্যানিকিন:

এ-নামটি পুরুষ জাতের পরী—নোম, ব্রাউনি, এল্‌ফ… সকলের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হচ্ছে।

ম্যানিকিনকে দেখা যায় গাছে, বেড়ায়, ঘাসের

ঝোপে-ঝাড়ে এবং বুনো ফুলের গাছে, ফুলে। গাছে যে-সব ম্যানিকিন থাকে, তাঁরা থাকে গাছের গুঁড়িতে, গাছের ডালে; থাকে গাছের ছালের নীচে। ঐ ছালের নীচে দিয়ে দিয়েই এরা চলাফেরা করে। এদের কাজ—গাছের ডালে পাতায় এবং ফুলে ফলে রঙ ধরানো।

ঘাসে বা ঝোপে-ঝাপে যেসব ম্যানিকিন থাকে, তাদের রঙ সবুজ…যেন সবুজ রঙের পোষাক পরে আছে! মুখগুলি তিন-চার বছরের মানবশিশুর মতো…মাথায় যেন সবুজ টুপি পরে আছে, এমনি ঝুঁটি! চোখ কাঁচের মতো ঝকঝক করছে…কাণ লম্বা লম্বা।

হডশন লিখছেন—আমি ছুবার ম্যানিকিন দেখেছি… চেহারার যে-বর্ণনা দিলুম, ঠিক ওমনি। এদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে কোনো ফল পাইনি। কাছে গেলে এদের চলাফেরা হয় বন্ধ এবং এমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে…দেখে মনে হয়, আতঙ্ক হয়েছে! ছোট ছোট ম্যানিকিনদের সম্বন্ধে এ-কথা বলছি।

এক-জাতের ম্যানিকিনের পাখা দেখেছি। পাখার আকার ডিমের মতো, অর্দ্ধ-স্বচ্ছ এবং বেশ ঝকঝকে… in glistening semi-transparent. সে-পাখায় ভর করে এরা উড়তে পারে না…কিন্তু এদের চলায় ফেরায় পাখা কাঁপতে থাকে বোলতার পাখার মতো।

ইংলণ্ডে নানা জাতের ম্যানিকিন দেখে আমার বিশ্বাস, এরা সাধারণ জাতের পরী…সকল দেশেই এদের বাস। অন্য জাতের নেচার-স্পিরিট সম্বন্ধে সন্ধান করবার সময় আমরা বহু ম্যানিকিনের দর্শন পেয়েছি। তারা আমাদের

দিকে এগিয়ে এসেছে, আমাদের লক্ষ্য করেছে। এরা এসেছে আমাদের কাছ থেকে আট থেকে বিশ ফুট দূরে... দলে দলে এসেছে...কখনো এসেছে জোড় গেঁথে।

ইংলণ্ডের কেনসিংটন গার্ডেন্সে নিত্য বহু ম্যানিকিনের দর্শন মেলে। এরা নিজেদের মধ্যে যখন আলাপ-আলোচনা করে, তখন এদের কণ্ঠে যে-শব্দ বেরোয়...চড়াইয়ের কিচির মিচিরের মতো শব্দ যেন। তবে এদের বেশীর ভাগেরই দেখেছি, ভয়-ডর যেমন নেই...ভাবসাব করবার মতো প্রবৃত্তিও তেমন নেই। আমাদের কাছে এসেছিল শুধু উদগ্র কৌতূহলের বশে।

গেছো ম্যানিকিন: কেণ্ডালের কাছে এক বনে দেখা ...১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে।

বড় গাছের তলায় মাটীতে দেখেছি কটা ম্যানিকিন। গাছের তলায় অজস্র ঝরা পাতা পড়েছিল...সেই ঝরা পাতার উপর তাদের দেখেছি। এদের মুখ যেন বুড়ো মানুষের মুখ, লোল চর্ম...শুকনোপানা, গায়ের রঙ লালচে, ছুঁচোলো দাড়ি আছে, চোখে ভ্রূ আছে...ভ্রূর রঙ গ্রে। মাথার গড়ন এমন যেন কোণওয়ালা ক্যাপ মাথায় আঁটা ...তবে এ-টুপির সামনের দিকে কাণা ঝুলচে যেন! পা সরু সরু, আঙুল নেই...আঙুলের দিকটা সরুপানা।

একটা আশ গাছের তলায় দেখেছি, এক বুড়ো ম্যানিকিন বসে আছে...পা দুখানা সামনের দিকে ছড়ানো। তাকে দেখে মনে হলো, যেন বড় ক্লান্ত। আমি তাকে একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছি...যেমন তার নজর পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে গাছের গায়ে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো।

প্রায় দশ মিনিট তার আর চিহ্ন নেই! দশ মিনিট পরে দেখি, আবার এসেছে! এখন মোটে ক্লান্ত নয়…যেন বেশ চাঙ্গা হয়েছে! তার আগমন আমি জানলুম হঠাৎ গাছের গোড়ায় দপ করে আলো জ্বলে উঠলো দেখে। এসে সে নাচতে লাগলো…গাছ থেকে প্রায় সাড়ে আঠারো ফুট দূর পর্য্যন্ত জায়গা জুড়ে নাচ।

অক্টোবর মাসে একদল ম্যানিকিনকে দেখেছি, বড় একটা বীচ গাছের ধারে পাতায় আর ডালে ডালে…সকলে ভারী ব্যস্ত। দলে দলে উড়ে তারা মাটীতে নেমে আসছে…আবার পরক্ষণে উড়ে গাছের ডালে পাতায় গিয়ে বসছে। ছোট ছোট পাতায় আর ডালে যেন কি বুনুনির কাজ করছে—তাদের নড়াচড়ার ভঙ্গী দেখে তা বেশ উপলব্ধি করেছিলুম। মাথায় এরা চার থেকে ছ ইঞ্চি উঁচু…আকার নমনশীল (elastic) …চেহারা মানুষের মতো। তাদের বাস গাছের ডালে, গাছের পাতায়। তাদের যা কিছু কাজ, তা ঐ পাতা আর ডালকে নিয়েই। তবে একটি গাছেই শুধু থাকে না…এ-গাছ থেকে পাশের গাছে উড়ে গিয়ে বসছে—এমন দৃশ্যও আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

ম্যানিকিন দু'রকম রঙের দেখেছি—লাল আর সবুজ। ঘাসের বনে দেখেছি সবুজ রঙের ম্যানিকিন—তাদের গড়নে কোনো ছাঁদ নেই, শৃঙ্খলা নেই…of peculiar shape and irregular outline. তাদের কাজ, মাটীর ঘাসকে গজিয়ে তোলা…ঘাসের লালন, ঘাসের পরিচর্য্যা। ম্যানিকিনকে উড়তে দেখেছি…তবে বেশী দূরে উড়ে যেতে পারে না—এ-গাছ থেকে ঐ পাশের গাছে। ওড়ার ভঙ্গী ঝোলা বা দোল

খাওয়ার মতো। মাঠে এরা বড় বড় দল বেঁধে থাকে…বড় বড় দল বেঁধেই চলাফেরা করে।

আণ্ডাইন: জল স্পিরিট: আণ্ডাইন হলো জলের জীব। এদের দেখেছি নদী বা ঝিল, লেক, দীঘি বা ঝর্ণার প্রপাতের কাছে। এরা মেয়েজাতের জীব। আমি পুরুষ জাতের আণ্ডাইন দেখিনি। নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির মতো চেহারা …সাধারণতঃ পাখা নেই…দেখতে অপরূপ। ঝর্ণাতেই বেশী বেশী আণ্ডাইন থাকে। ঝর্ণার ঝরা জলে রোদের রঙঝুরিতে এরা বিপুল আনন্দ পায়।

১৯২২ সালে এপ্রিল মাসে হোয়াইটেনডেলে সব প্রথম আমি আণ্ডাইন দেখি। একটা ঝর্ণার ধারে পাথরের উপর বসেছিলুম জলপরীর সন্ধানে। জলপরীর দেখা বড় মেলে না…স্থলপরীর দেখা মেলে বেশ ভালো করে। এমন সময়ে দলে দলে আণ্ডাইনের আবির্ভাব…প্রায় বারোটি আণ্ডাইন। তারা ঝর্ণার ঝরঝর জলধারায় নৃত্য করতে লাগলো—ছোট বড় মাঝারিপানা সাইজের আণ্ডাইন। ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে লম্বা, মাথায় সে দু ফুট উঁচু। জলে সে ঝাঁপাচ্ছে। আমি দেখেছি, গোলাপী আলোর রেখা…কি ক্ষিপ্র গতিভঙ্গী—জলপরীর মূর্ত্তি! দলের বাকিদের মধ্যে কেউ সবুজ রঙের, কেউ ফিকে নীল রঙের আলোর মূর্ত্তি! জলের ধারায় ধারায় তারা উঠছে-নামছে…পাহাড়ের পাথর থেকে ঝাঁপ খেয়ে জলে পড়ছে! কি বিচিত্র ছন্দভরা ভঙ্গী।

পরী (Fairies)

হডশন লিখছেন—১৯২১ সালে ১৭ই অক্টোবর তারিখে এক বাগানে আমার প্রথম পরী দর্শন—হাস্যময়ী লাস্যময়

মূর্ত্তি! তাকে ঘিরে উজ্জ্বল সোনালি আলোর আভা—surrounded by an aura of golden radiance. সে-আলোর আভায় তার সোনালি রঙের দুখানি পাখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কি নির্ভীক মূর্ত্তি!

১৯২২, অগষ্ট মাসে স্নোফল পাহাড়ের ঢালু গায়ে দ্বিতীয় বার পরীর দেখা মিলেছিল। দলে আমরা অনেকে ছিলুম। সালবি গ্রেনের পাহাড়ে চড়ছিলুম…হঠাৎ দেখি, পরী…পুরুষ-মেয়ে দু জাতের পরী। মাথায় চার থেকে ছ ইঞ্চি লম্বা। পাহাড়ের গা বয়ে বেশ শান্তভাবে তারা নামছিল। তাদের চোখে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব, অধরে হাসি, দেহ সুছাঁদে বহু যত্নে গড়া যেন! মেয়ে-পরীদের গড়ন এমন… দেখলে মনে হয়, ঝকঝকে সাদার সঙ্গে নানা রঙ মিশিয়ে তৈরী পোষাক পরে আছে। পুরুষদের দেখলে মনে হয়, বেশ ঝকঝকে সিল্কের পোষাক পরা যেন! তাদের পোষাকের রঙ রয়েল-ব্লু রঙের বিজলী আলোর মতো…পোষাকের ছাঁদ সেই ষ্টুয়ার্ট যুগের মতো।

১৯২২, ডিসেম্বর মাসে কেণ্ডালে আবার দেখি পরীর মেলা! এখানে যে-সব পরী থাকে, তারা অপরূপ রূপসী। তাদের চলার ভঙ্গী মনোহর ছন্দানুগ…with extreme grace and beauty. তাদের ঘিরে আলোর বাল্‌ব্‌ জ্বলছে যেন…মাথায় গলায় যেন আলোর ফুলের মালা! আমাদের তারা দেখলো, মনে হলো…দেখে তাদের মুখে হাসি ফুটলো। তারা এলো আমাদের কাছে। তাদের মাথায় কালো চুল… আজানুলম্বিত কেশ—জায়গাটা মনে হলো যেন পরীস্থান (Fairy-land)।

এই বছরেই প্রেষ্টনে একটি পরীর দেখা পেলুম···a beautiful nature spirit···যেন দেবী মূর্ত্তি। মাথায় তিন-চার ফুট···যেন আলো-ঝলমল পোষাক পরা। আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো···সোজাসুজি দৃষ্টি। তাকে ঘিরে আলোর রশ্মি···থেকে থেকে বিদ্যুতের মতো চমক দিতে লাগলো।

লাঙ্কাশায়ারেও একদিন একঝাঁক পরী দেখেছি। হাস্ত-ময়ী লাস্তময়ী মেয়ে-পরী, পুরুষ-পরী। তাদের অধিনায়কতায় দেখলুম, একটি মেয়ে পরীকে। তার কপালে জ্বলজ্বল করছিল একটি নক্ষত্র। আর তার পাখা দুখানা বেশ বড়। পাখার বর্ণ ফিকা পিঙ্ক···তার সঙ্গে আরো নানা রঙের আভা—সবুজ সোনালি আর লাভেণ্ডার রঙ মিশে অপরূপ মাধুরীর সৃষ্টি করেছে। পরীর গতিভঙ্গী নৃত্যছন্দে এবং সে-ভঙ্গীর দরুণ অত রকম রঙের ফুলঝুরি ঝরতে লাগলো যেন। তার মাথায় সোনালি রঙের খোলা কেশের রাশি। কি সুছাঁদে গড়া দেহ ···অথচ দেখলে মনে হয়, অসাধারণ শক্তিময়ী—stamped with a decided impression of power. নীল চোখ··· সে-চোখে যেন নক্ষত্র জ্বলছে! আমাদের সে লক্ষ্য করেছিল ···দেখে আমাদের দিকে হাসিমুখে মাথা নামিয়ে অভিবাদন জানালো। মুখে কথা নেই···কিন্তু চোখের দৃষ্টিভঙ্গীতে আনন্দসম্ভাষণের সুস্পষ্ট আভাস পেলুম।

ঝড়ের স্পিরিটঃ ১৯২৩ সালে ১০ই জুলাই তারিখে রাত তিনটের সময় লণ্ডনে যে প্রলয় ঝড় হয়েছিল, সেই ঝড়ের সময়কার কথা বলছি।

হডশন লিখেছেন—সে কী ভয়ানক ঝড়! সমস্ত বায়ুমণ্ডলে

যেন ওলট-পালট ঘটে যাবে! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে··· মুহুর্মুহু বাজের আওয়াজ···ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে প্রলয় ঝড় —সে-ঝড় থামবে বলে মনে হয় না!

সেই ঝড়ে আমরা ভাবলুম, এ-ঝড়ে স্পিরিট আছে নিশ্চয় ···দেখতে হবে; এবং দেখলুম। বড় বড় সব বাদুড় যেন··· দেহগুলো মানুষের মতো, অথচ মানুষ নয়···আকার বাদুড়ের মতো···কালো···কিন্তু সে কালো রঙ চিরে বিদ্যুতের ঝলক ফুটছে! তাদের কি মাতামাতি, কি ছুটোছুটি! কতক্ষণ ধরে আমরা দেখলুম তাদের মত্ত তাণ্ডব···তার পর যেন ক্লান্তিভরে সকলে ঝিমিয়ে এলো। তারপর স্তব্ধ—ঝড়ও থামলো।

দেব: হডশন দেবতা-দর্শনের কথা লিখেছেন—১৯২২, জুন মাস···লেক ডিষ্ট্রিক্ট জলপ্রপাত। সেখানে দেখি, nature devas···তাদের বর্ণ ঝকঝকে সাদা···যেন উজ্জ্বল সাদা মেঘ! দেখবামাত্র মনে হয়, যেন ঝকমকে সাদা পোষাক পরা···আকার মানুষের মতো···মাথায় ছ ফুট···আর মূর্ত্তি ঘিরে তার ডবল্ উঁচু উজ্জ্বল সাদা জ্যোতি।

লেক-দেব: থিরিমিরি হ্রদের পশ্চিম তীরে দেখেছি দেবতা ··লেকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ···গায়ের বর্ণ অস্ত-সূর্য্যের রশ্মির মতো লাল···মুখ যুবার মতো···দেহ ঘিরে ঝকঝকে সাদা জ্যোতি।

লেক অঞ্চলে···পাহাড়ের ধারে···লেকের তীরে আরো বহু দেব-স্পিরিট দেখেছি···যেন আলোর শরীর। নানা রঙের দেব···লাল, ব্রাউন, সবুজ, হলদে, সোনালি রঙের··· দেবদের কলোনি যেন! যারা আকারে ছোট, তাদের পাখা আছে। বড়দের পাখা নেই—তারা থাকে পাহাড়ের মাথায়।

বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল তারা…আমরা দেখেছিলুম তাদের নানা খেলা। পুরুষমূর্তি, নারীমূর্তি…মানুষের আকার …আবার ছোট আকারেরও আছে। মেয়েদের বড় বড় পাখা …মাথায় তারা ছ ফুট, আট ফুট উঁচু…গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল সোনালি—উড়ে বেড়াচ্ছে…পাখীর চেয়েও গতি লঘু এবং ক্ষিপ্র। কতকগুলি পরী উড়ছিল পাখীর মতো ভঙ্গীতে।

একদিন একটা পাহাড়ে সাতশো ফুট ওঠবামাত্র একটি দেব দর্শন হলো। তার চোখ…মনে হয়েছিল, যেন আগুন জ্বলছে —ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাইলো। আমি তাকে দেখেছি যেমন বুঝলো, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো…যেন আলো নিবে গেল!

উদ্ভিদেরও দেব আছে…তাদেরো দেখেছি ঐ থার্লমীর নদীর কূলে, পাহাড়ে, বনে। তাদের কাজ গাছপালার লালন-পালন এবং রক্ষা…তাদের সেই কাজ করতে দেখেছি।

১৯২৩ সালে জুলাই মাসে এপিং ফরেষ্টে হুডশন দেখেন, বন বনদেবতায় পূর্ণ (tree-spirits)। এরা সম্পূর্ণ বন্ধ জাতের 'দেব'…আকার মেয়েলি…গায়ের রঙ সবুজ—পাতার সবুজের মতো নয়…মরকত মণির মতো সবুজ—তবে সে-রঙে জলুশ একটু কম। মাথায় দীর্ঘ কেশ…কালো কেশ …গলায় পাতার মালা দুলছে যেন। এ-বনের প্রত্যেকটি গাছে tree spirits দেখেছি। তাদের গায়ের সবুজ রঙের আভায় গাছের ডালপাতা ঝকঝক করছে। ছোট গাছগুলোতে অসংখ্য ট্রি-স্পিরিটের বাসা।

লাঙ্কাশায়ারেও বনে-জঙ্গলে বহু ট্রী-স্পিরিট বা বনদেব দেখেছি। এদের রঙ সবুজ…যেখানে থাকে, সেখানটায়

সবুজ-আলোর লহর দেখা যায়। জেনেভায় বড় বড় ফার গাছে হডশন যে-বনদেবতা দেখেছেন…সেগুলো দেখলে মনে হয়, যেন গাছের গায়ে, ডালে ডালে সবুজ রঙের ছুঁচ ঝুলছে। বহু বিচিত্র তাদের বর্ণ। তারা মানুষ দেখলে পালায় না… যেন মানুষের সঙ্গে বহুকালের পরিচয় আছে! এরা তাদের গায়ের ঐ সবুজ রঙের আভা—টর্চের আলো ফেলে যেমন বহুদূর পর্য্যন্ত সে-আলো নিক্ষেপ করা যায়…এদের গায়ের সবুজ রঙের আভা এরা তেমনি বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে ফেলতে পারে। এ-আলো ফেলে এরা চুপচাপ থাকে। মনে হয়, ঐ আলোর আভায় গাছপালার প্রাণশক্তিকে রক্ষা করে; বাড়িয়ে তোলে। জেনেভায় বনে-জঙ্গলে এক জাতের নোম তিনি দেখেছেন…তারা বাতাসে ভেসে বেড়ায়, ঘাসের বনে ঘাসে ঘাসে মিশে বেড়ায়…এদের দেখতে spongy texture-এর মতো। মুখ কালোপানা এবং সর্ব্বসময়ে এদের দেহ vibrate করছে এবং সে vibration-এর ফলে সবুজ রশ্মি ছিটিয়ে চলেছে। এ-নোমরা থাকে গাছের গুঁড়ির কাছে…মাটীতে। কটা নোমকে তিনি দেখেছেন, গাছের গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে এলো…যেন ঘরের দরজা খুলে এলো বেরিয়ে!

চৌদ্দ

ওপারের খবর : ক্লেয়ারভয়ান্স

বিলাতের 'স্বস্তিকা' পত্রে এ-কাহিনী ছেপে বেরিয়েছিল …এক সম্ভ্রান্ত মহিলার লেখা বিবরণ।

তিনি লিখেছিলেন—আমার স্বামী ছিলেন ব্যাঙ্কার।

১৯০৩ সালে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলো···র‍্যাঞ্চে আমি একা···নিরালা জায়গা। সে-বছর সেখানে তখন কী প্রচণ্ড শীত! সে-শীতে প্রাণ বাঁচানো দায়। র‍্যাঞ্চ ভাড়া দিয়ে আমি থাকি। স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পরে···তখনো আমার শরীর-মন বেশ দুর্ব্বল—পনেরো দিনের মধ্যে আমার যে দুজন ভাড়াটে ছিল, তারা র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে গেল। আর ভাড়াটে পাই না···একা থাকি···সঙ্গে শুধু এক বিশ্বাসী চাকর—জাতে সে স্কচ।

জীবনে দায়-দায়িত্ব বড় জটিল···কাজেই নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছিল। একদিন বৈকালে বাড়ীঘর মেরামত করার আলোচনা করে কনট্রাকটরকে বিদায় দিয়ে কুকুর নিয়ে আমি বেরুলুম···এলুম, কি ষ্টক মজুত আছে···দেখতে। সন্ধ্যা নামছে···বাড়ী ফিরলুম··· ফিরে ছোট টেবিলের ধারে বসে কাগজপত্র দেখছি।

কুকুরটা বসে আছে আমার পায়ের কাছে নিঃশব্দে··· আমি একমনে কাগজপত্র দেখছি। হঠাৎ ভৌ-শব্দ করে কুকুরটা উঠলো লাফিয়ে···উঠেই লনে ছুটলো। কে এলো, বুঝি! আমি চাইলুম লনের দিকে···দেখি, কুকুরটা চুপ করে লুটিয়ে পড়লো। তার দিকে চেয়ে আছি আমি···দেখি, এক-একবার সে মাথা তুলছে···কি যেন দেখছে···দেখে ভৌ করে একটা ডাক ছাড়চে।

আমি তাকে ডাকতে লাগলুম···কিন্তু সে আমার কাছে এলো না, আমার পানে ফিরেও তাকালো না! আমি কাগজ-পেন্সিল রেখে উঠতে গেলুম চেয়ার ছেড়ে··· কিন্তু উঠতে পারলুম না। পেন্সিলটা দেখি, কে যেন

আমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে···সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানাও!

আমি অবাক! পেন্সিলটা আমি ধরলুম চেপে···কিন্তু কাগজে সেটা এমন সেঁটে আছে যে কিছুতেই কাগজ থেকে টেনে হাতে নিতে পারি না! বেশ জোরে চেষ্টা ···পেন্সিল হাতে এলো···নেবামাত্র আমার হাত কাঁপতে লাগলো! পেন্সিল রেখে আমি ঘরে এলুম। এবারে চেয়ার ছেড়ে আসতে কষ্ট হলো না। ঘরে এসে আর একটা পেন্সিল এবং কাগজ নিলুম। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে দেখি, যে কাগজ-পেন্সিল রেখে গিয়েছিলুম···সে-কাগজে একটা লেখা। লেখা পড়লুম। দেখি লেখা রয়েছে—Death is blessed rest···মৃত্যু বিশ্রাম। কার লেখা? কে লিখলো?

আলো জেলে সে-আলোয় ভালো করে দেখে হাতের লেখা চিনলুম—এ আমার স্বামীর হাতের লেখা।

আমার সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ। স্বামীর কথা এর মধ্যে চিন্তাও করিনি···হঠাৎ তাঁর লেখা!

ভয় হলো। কাগজখানা ফেলে দিয়ে ছুটে লনে নামলুম। কুকুরটাকে টানতে টানতে র‍্যাঙ্কের গোলাঘরে এলুম এবং সে-রাত্রে খাওয়া দাওয়া নয়···গোলাঘরে জেগে রাত কাটালুম ···কুকুরকে সাথী করে!

কিন্তু ব্যাপার এই সুরু···ঐখানেই তার সমাপ্তি নয়। পরের দিন নানা অঘটন। ঘরের টেবিল-চেয়ার এখান থেকে ওখানে চলেছে···সেখানকার জিনিষ এখানে আসছে —কে আনে? চোখে কিছু দেখি না। ভয় হলো, এ কি উৎপাত হঠাৎ! দরজা বন্ধ করে দিই···দরজায় ঘনঘন

করাঘাত···ও ঘরের বন্ধ দরজা ধড়াস করে গেল খুলে! লোকজন কাজ করছে দূরে···বাড়ীতে আমি একা, আর আমার কুকুর। চাকর ব্রেকফাষ্ট নিয়ে এলো···টেবিলে রাখলো···রেখে সে গেল চলে। খেতে বসবো···হঠাৎ খাবার সমেত টেবিল গেল কাছ থেকে সরে।

বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে প্রথমে গেলুম পাদরীর কাছে। তাঁকে এ-কথা বলতে তিনি যে-দৃষ্টিতে চাইলেন···তাতে আশা-ভরসা মিললো না! আরো ভয় হলো। তিনি বললেন—ও-বাড়ীতে যেয়ো না, থেকো না।

এ-কথা মনে নিতে পারলুম না···আরো দু-একজনের কাছে গেলুম। একজন বললেন—চলুন, আমি যাবো আপনার সঙ্গে।

তিনি এলেন···এসে সে-কাগজ দেখলেন—সে-কাগজে তখন আরো ক'ছত্র লেখা হয়েছে। একটা নাম দেখলুম··· সে-নাম—জোশুয়া।

কে এ জোশুয়া? সে-ভদ্রলোক বললেন—পরলোক থেকে কেউ এসেছেন।

আমি বললুম—হাতের প্রথম লেখা আমার মৃত স্বামীর।

তিনি বললেন—বটে! দেখা যাক।

তিনি বসলেন টেবিলে···বসে দুচোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি হাতে নিলেন সেই পেন্সিল··· কাগজে ধরতে কাগজে লেখা ফুটলো···সে-লেখা পড়লুম। কাগজে লেখা—জোশুয়া এ-ব্যাঙ্কে কাজ করতো···তার পর অন্য জায়গায় যায়। তার স্ত্রী আছে এ-সহরে। লেখা পড়লুম—জোশুয়ার এ্যাকসিডেন্ট···বাঁচবে না···এল-সহরে সে

আছে। তার স্ত্রীকে খবর দাও, এখনি যদি এল সহরে যায়···
তাহলে স্বামীর সঙ্গে শেষ-দেখা হতে পারে।

সে-ভদ্রলোক তখন ব্যস্ত হয়ে সন্ধান করে পেলেঃ জোশুয়ার স্ত্রীকে। তাকে এ-খবর জানাতে সে-স্ত্রী গেল এল-সহরে। এবং শুনেছি, সেখানে সে গিয়ে তার স্বামীকে দেখে হাসপাতালে—বড় কাঠ চাপা পড়ে স্বামীর মাথা ভেঙ্গে গেছে। স্ত্রী যাবার দু ঘণ্টা পরে স্বামী হাসপাতালে মারা গেছে।

শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদিত হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন থেকে তাঁর বক্তব্য সঙ্কলিত করে দিলুম।

স্পিরিট তার আবির্ভাব কি করে জানায়···দু-একটি কাহিনী বলি।

তিনি এক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য সাইকিকের কথা-প্রসঙ্গে বলেছেন সেই সাইকিকের উক্তি। ১৮৪৮ সালের কথা। স্পিরিটের সঙ্গে আমাদের নিত্য আলাপ-আলোচনা হয়, স্পিরিটের ফটো তোলা হয়। একদিন স্পিরিটের ফটো উঠলো···বাতাসে-ভাসা ছায়ামূর্ত্তি! চেহারার আদল দেখে অনেকে চিনলেন···ইনি ছিলেন বিখ্যাত সাঁতারু···যাঁর বাড়ীতে চক্র বসেছিল এবং ছবি তোলা হয়েছিল, তাঁদের নিকট-আত্মীয়।

এবারে ক্লেয়ারভয়ান্সের কথা বলি। 'স্বস্তিকা' পত্রের লেখা সঙ্কলিত করে দিচ্ছি।

ক্লেয়ারভয়ান্সের ব্যাখ্যা করে লেখক বলেছেন—
The faculty of the subconscious mind which enables us to describe distant places is to predict events which are still in the future.

মনের এ-শক্তি হয় নৈষ্ঠিক সাধনায়। লেখক লিখেছেন —বারো বছর আগে এমনি শক্তিসম্পন্ন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন এ-শক্তির অনুশীলনে কারো তেমন আগ্রহ ছিল না। দু-চারজন একান্তে শুধু এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এখন অনেকে সাধনায় এ-শক্তির অধিকারী হয়েছেন। তবু তাঁদের মধ্যে শতকরা পাঁচজন মাত্র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারেন। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়বোধ—একটির সঙ্গে অপরগুলির যোগ আছে। কোনো ফলের বা খাবারের স্বাদ শুধু রসনায় আমরা উপলব্ধি করি না…সে-ফল বা খাবার চোখে দেখেও তার স্বাদ উপলব্ধি করি। সাইকিক ব্যাপারে এ পরস্পর-সাপেক্ষতা অনেক বেশী। তবে আমাদের সাইকিক অনুভূতির সঙ্গে স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির তফাৎ শুধু intellectual perception-এর মাত্রায়। যাঁদের তীক্ষ্ণ intellect…তাঁরা সাইকিক রীতিতে বহুদূর-প্রসারী ঘটনাদি আভাসে দেখতে পান এবং চট করে তা তাঁরা উপলব্ধি করেন।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন—As we rise high in the scale of intellectual cultivation or rather in mind-concentration we unconsciously enter the field of psychic faculty.

ক্লেয়ারভয়ান্সের মধ্যে তাহলে অলৌকিক বা রহস্যময় কিছু নেই। বর্তমান সম্বন্ধে সব উপলব্ধি করা…আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে তা হয়। কেউ চট করে তা উপলব্ধি করতে পারেন, কেউ বা তা পারেন না। নিত্যদিন আমাদের কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—যাঁদের ইনটেলেক্ট বেশী, বোধশক্তি প্রবল, তাঁরা ভেবেচিন্তে চট করে

সে-সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারেন··· যাঁদের সে-শক্তি কম, তাঁরা তা পারেন না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এ-শক্তি যেমন অনুশীলনে, চর্চায় বা সাধনায় বাড়ানো যায়···তেমনি মনের সাইকিক-চেতনাও আমরা সাধনায় বাড়াতে পারি। যাঁরা পারেন···ক্লেয়ারভয়ান্স তাঁদের কাছে রহস্যাচ্ছন্ন বা সুদূরপরাহত থাকে না। ক্লেয়ারভয়ান্সে আমরা চিন্তাকে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করতে পারি—এ শুধু extension of our physical faculties···স্রেফ thought transference.

এই চিন্তা-প্রক্ষেপ বা thought transference··· সম্বন্ধে লেখক দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লিখেছেন—Denver Post-এর সম্পাদকের ঘরে একদিন বসে আমি কাজ করছিলুম···হঠাৎ কাণে কটি কথা শুনলুম। ঘরে আরো লোক ছিলেন··· তাঁদের প্রশ্ন করলুম—কিছু বলচেন আপনারা? কথাগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন···তাই এ-প্রশ্ন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—কথা কয়ে আমি কিছু বলিনি···তবে মনে চিন্তা করছিলুম। একটা গল্প লিখবো···সে-গল্পের কি নাম দেবো, সেই নাম ভাবছিলুম মনে মনে।

এমন ঘটনা অনেকের জীবনেও ঘটে। আমরা কজন তা লক্ষ্য করি? ক্লেয়ারভয়ান্সের মূলে অনেক সময় থাকে inner conviction···অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস। বাহিরের কোনো ঘটন বা যুক্তির সঙ্গে এ-বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক থাকবে, এমন কথা নেই! ক্লেয়ারভয়ান্স যে সব সময়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আভাস দেবে, তাও নয়। ভবিষ্যৎ বলার সঙ্গে ক্লেয়ারভয়ান্সকে অনেকে একীকরণ করেন···সেটা ঠিক নয়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লেখক লিখচেন—একবার এক আসরে

অনেকে আমরা উপস্থিত ছিলুম। আমাদের আসরে সতেরো বছর বয়সের একটি ছেলেও ছিল। ক্লেয়ারভয়ান্স তার অসাধারণ শক্তি—কিন্তু কখনো ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কিছু বলতে পারতো না। তবে যে-ঘর, যে-জায়গা বা যে-মানুষকে সে জীবনে কখনো দেখেনি···সেই ঘর, সেই জায়গা এবং সে-মানুষের সে আশ্চর্য্য নিখুঁৎ বর্ণনা বলতে পারতো। শীল-করা প্যাকেটের মধ্যে কি আছে, না-দেখে তাও সে অনায়াসে বলতে পারতো। তাকে বহুবার পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি, এ-সবে সে যা বলতো···কখনো তার ভুল হতো না। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো, কাল কি হবে? কিম্বা সামনের হপ্তায় অমুক ব্যাপারে কি ঘটবে? সে-সব প্রশ্নের সে কোনো জবাব দিত না। যদি আমরা জেদ করে বলতুম, চেষ্টা করে ছাখো না···যদি বলতে পারো! সে-কথায় সে যা বলতো, কখনো তা মিলতো না। কাজেই ক্লেয়ারভয়ান্স মানে, ভবিষ্যৎ বলতে পারবেই, তা নয়।

এই অন্তর-ইন্দ্রিয়ানুভূতি···mind senses কি করে লাভ করা যায়?

লেখক বলেন—এ-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত···অর্থাৎ নানা জাতের নানা মত। আমি এ-শক্তি অনেকখানি লাভ করেছি···কিন্তু সম্প্রতি ক'বছর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোনো কথা বলি না। যখন বয়সে বালক ছিলুম, তখন নানা বিষয়ে আমি যে-ভবিষ্যৎবাণী বলতুম···বেশীর ভাগ সম্পূর্ণ মিলতো। কি করে বলতুম, জানি না···বিনা-আয়াসে বিনা-মাধ্যমে বলতুম। এর জন্য বাড়ীতে শাসন চলতো। সকলে বলতেন —এ কি বদ স্বভাব···সব তাতে ওস্তাদী করো! এতে দারুণ মিথ্যাবাদী হবে এককালে।

মনোবিজ্ঞানের মূল কথা হলো, আমরা সকলেই সচেতন এবং মানুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব আছে—we are self-conscious and responsible beings···কাজেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি করে আমরা কিছু বলতে পারবো? এ-শক্তি

ভগবানের বিশেষ কৃপা কিম্বা ভাগ্যের অপূর্ব্ব বিধান ছাড়া সাধারণের থাকতে পারে না···বা সাধারণে তা লাভ করতে পারে না। কিন্তু আমি বলবো, ভবিষ্যৎ বলা···prophecy··· মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। জগতের সব ঘটনা পরম্পরাপেক্ষী। বহির্জগতে নিত্য আমরা যা ঘটতে দেখছি, তা থেকে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বহু ব্যাপারে পূর্ব্ব থেকে আমরা যা ঘটবে, তা বুঝতে বা বলতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। কেন না, সে সব ঘটনা কার্য্য-কারণ সম্পর্কে গাঁথা। এ-কাজের এ-ফল—এ ঘটবে বাঁধা নিয়মে। ক'বছর আগে যে-কাজ করেছি, তার ফল পরে ফলবে···এ কথা বোঝা এবং বুঝে তা বলা—সংসারে এমন নিত্য ঘটছে। কোনো রোগ হলো—পূর্ব্বে এ-রোগ যার হয়েছিল, সে-রোগে তার যা হয়েছিল···প্রত্যক্ষ করেছি—তাই এবার এ-রোগে কি ফল হবে···আমরা তার ফলপ্রাপ্তির আগে থেকে কেন বলতে পারবো না? এমনি কার্য্য-কারণ চলে আসছে আমাদের জন্ম নেবার আগে থেকেই। এজন্য একটা চলিত কথা আছে ইংরেজীতে—History repeats itself.

এমন ঘটা—একে কেউ বলেন বরাত, কেউ বলেন ভাগ্য, কেউ বলেন বিধিলিপি! এর জন্য আমাদের দায়-দোষ কি থাকতে পারে—প্রশ্ন উঠবে। We are under the relative law of cause and effect.

আগে যে vibration-এর কথা বলেছি, সেই কথার জের টেনে বলছি—এ vibration-এ এদিক-ওদিক ঘটানো আমাদের হাতে নির্ভর করে। একটা পিস্তল আছে, গুলি আছে···আমি পিস্তল নিয়ে তাতে গুলি ভরে একজনকে তাগ করে ছুড়লুম। এখানে আমি হলুম গুলি ছোড়ার কারণ স্বরূপ এবং এ-কারণে ফল হলো, যাকে তাগ করে গুলি ছুড়লুম···তার মৃত্যু! কাজেই vibration-এ এদিক-ওদিক ঘটাবার জন্য আমি দায়ী। Vibration-এ তারতম্য যদি ঘটাতুম ···কোনো ভালো দিকে, তাহলে নিশ্চয় ভালো ফল পেতুম।

যা ঘটবেই···আগে থেকে সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী ঘোষণা করা—এই শক্তিটুকুই ক্লেয়ারভয়ান্সের সর্ব্বস্ব নয়। তা যদি হতো, তাহলে পৃথিবীর এত জাত ওর দৌলতে ভবিষ্যৎ জেনে চুপচাপ বসে থাকতো। এত মাথা ঘামানো, এত পরিশ্রম করে কোনো কিছু করতো না। কেন না, যা ঘটবেই, তা তো জানা হয়ে গেছে···তবে আর এত পণ্ডশ্রম কেন?

ক্লেয়ারভয়ান্সের লক্ষ্য—আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সাধনায় জাগিয়ে তোলা, লালন করা, তাকে রীতিমত শক্তিমান করে তোলা। তা করতে পারলে বহু অশান্তি, বহু অনর্থ থেকে আমরা নিস্তার পেতে পারবো।

লেখক লিখছেন—ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, এর দৌলতে আমি বহু এ্যাকসিডেন্ট, আর্থিক ক্ষতি এবং আরো বিবিধ দুর্গতি থেকে নিজেকে যেমন রক্ষা করে চলতে পেরেছি···তেমনি বহুজনকে সে-সব থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি। এ-শক্তির দৌলতে পথ চলতে আমি দেখতে পেয়েছি, কোথায় আছে দুর্গম শৃঙ্গ, কোথায় সাংঘাতিক পতনের খাদ; এবং মনের দুর্দ্দম আবেগ, বাসনা, যথেচ্ছাচার প্রভৃতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি।

এ-শক্তি মানুষকে অমানুষ হতে দেবে না···তাকে সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবে। শুধু তাই নয়, সাধনায় এ-শক্তি জাগিয়ে বাড়িয়ে তুলতে পারি যদি, তাহলে বিশ্ব-পৃথিবীর বহু অশান্তির দায় থেকে যেমন আমরা রক্ষা পেতে পারবো···মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্গতি, অশান্তিও তেমনি দূর করে এ-পৃথিবীতে স্বর্গসুখ ভোগের অধিকারী হতে পারবো আমরা—Only by cultivating and realising the use of these faculties that we may escape some of the conditions which are at present convergi[illegible] toward a crisis in the world's history.

শেষ